জেএনইউ দেশপ্রেম বনাম রাজনীতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম বিরোধী ঐক্য
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

কামদুনি থেকে সিতাই : ধর্ষক রক্তচোষারা সক্রিয়
— পৃ : ২৯

৬৮ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।। ১৬ ফাল্গুন - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ১৬ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৯ ফেব্রুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ৬-৮

খোলা চিঠি : বাবাকে গাধা বলার অধিকার চাই
 সুন্দর মৌলিক ৯

ভারতের বামপন্থীরা চিরকালই দেশবিরোধী
 গূঢ়পুরুষ ১০

জে এন ইউ দেশপ্রেম বনাম রাজনীতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম বিরোধী ঐক্য দেবব্রত ঘোষ ১১

অয়ম স্টার্টআপ শুভায় ভবতু অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩

উদ্ভাবনী প্রতিভাতে ভরসা রাখতে চান প্রধানমন্ত্রী
 দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ১৬

কতটা নৈতিক এই উগ্র ছাত্র আন্দোলন
 বিরাজ নারায়ণ রায় ২০

গীতার অষ্টম অধ্যায় : এযুগের বার্তা জগদীশ দত্ত ২১

মহাভারতের কথা : এক অলৌকিক মিলন
 অনিন্দ্যসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ২২

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডকারখানা কেন দূরভিসন্ধিপূর্ণ তা বোঝা দরকার কাঞ্চন গুপ্ত ২৭

কামদুনি থেকে সিতাই— ধর্ষক রক্তচোষারা সক্রিয়, জেগে না থাকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সাধন কুমার পাল ২৯

কাদের গুরু আফজল গুরু? শেখর সেনগুপ্ত ৩১

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চা ৩২

ভারত-আত্মার সন্ধানে ফেসবুকের জনক
 ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

**চিঠিপত্র : ১৯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ অঙ্গনা : ২৬ **
অন্যরকম : ৩৩ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮
 **খেলার জগৎ : ৩৯ শব্দরূপ : ৪০ **
চিত্রকথা : ৪১ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

হিন্দু সমাজের চেতনা জাগরণের কাজে স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র ভূমিকা সুবিদিত। সেই সঙ্ঘের শতবর্ষব্যাপী কর্মধারার কথাই এই সংখ্যার আলোচ্য। লিখেছেন স্বামী যুক্তানন্দ, ড. সুব্রত বিশ্বাস, শিলাদিত্য ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। থাকছে স্বামী প্রদীপ্তানন্দের সাক্ষাৎকার। তথ্যসমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি হবে সংরক্ষণযোগ্য।

দাম একই থাকছে ১০্ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

হায়দরাবাদ থেকে জে এন ইউ : অস্থিরতা সৃষ্টির চক্রান্ত

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। জেএনইউ-র বাম সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা কানহাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করিবার পর দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। কানহাইয়া কুমার এবং তাহার সঙ্গীসাথীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিনেতা তথা সংসদ আক্রমণকারী চক্রান্তের মূল চক্রী আফজল গুরুর নামে জয়ধ্বনি দিয়াছিল। 'আফজল গুরু অমর রহে'—এই পোস্টার সাঁটাইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, 'আজাদ কাশ্মীর'—এই দাবি তুলিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আন্দোলন করিয়াছিল। ছাত্র রাজনীতির সহিত কানহাইয়া কুমার ও তাহার সঙ্গীসাথীদের এই রাজনীতির যে বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই, তাহা বুঝাইয়া বলিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের এই কাজ সম্পূর্ণ দেশবিরোধী। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করিবার একটি ষড়যন্ত্র।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রোহিত ভেমুলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে জাতপাতের রাজনীতিকে উসকাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির এক চক্রান্ত। কিন্তু ইহাতে সত্যটি আড়াল করা যায় নাই। কানহাইয়া কুমারের মতো রোহিত ভেমুলার রাজনীতিও স্বচ্ছ ছিল না। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রোহিত ভেমুলা মুম্বই হামলার অন্যতম আসামি ইয়াকুব মেমনের সমর্থনে সমাবেশ করিয়াছিলেন। 'একজন ইয়াকুব মারা গেলেও, লক্ষ লক্ষ ইয়াকুব জন্ম নেবে'—এমনই পোস্টার দিয়াছিলেন রোহিত এবং তাহার সঙ্গীরা।

লজ্জাজনক হইলেও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতি রাহুল গান্ধী এবং সিপিএমের সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এই আন্দোলনকারীদের সমর্থনে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইল, রোহিত হইতে কানহাইয়া কুমার—বারবার দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িতদের পাশে দাঁড়াইয়া কী রাজনীতি তাঁহারা করিতে চাহিতেছেন? দলীয় স্বার্থে যে আগুন লইয়া খেলিতেছেন এই বোধ কি তাঁহাদের হইতেছে না?

অবশ্য ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কমিউনিস্টরা একসময় সুভাষচন্দ্র বসুকে 'তেজোর কুকুর' বলিয়াছিল। 'ইয়ে আজদি ঝুটা হ্যায়' বলিয়া পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করিয়াছিল। ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধে চীনের সমর্থনে সোচ্চার হইয়াছিল। অন্যদিকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হইবার পরও জরুরি অবস্থা জারি করিয়া কংগ্রেস ক্ষমতা আঁকড়াইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর দিল্লীতে শিখ নিধন চালাইয়াছিল কংগ্রেসই। ভারতের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র কায়েম রাখিবার প্রথম নজির সৃষ্টি করিয়াছে কংগ্রেসই। তাহারাই এখন কেন্দ্র সরকার ফ্যাসিবাদী আচরণ করিতেছে, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হইতেছে ইত্যাদি অভিযোগ করিয়া কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। অথচ দেশের সীমান্ত রক্ষা করিতে গিয়া যে জওয়ানরা শহিদ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তো দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিতেও দেখা যায় না। বস্তুত, সারাদেশে যে একটি অস্থিরতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হইতেছে, সম্প্রতি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাহা বলিয়াছেন। বিদেশ হইতে আসা টাকার স্রোত বন্ধ-সহ দেশের স্বার্থবিরোধী কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণেই এই অস্থিরতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা।

আশার কথা, এই দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্বজ্জনেরা একযোগে আওয়াজ তুলিয়াছেন। রাজধানীর বুকে নাগরিক মিছিলে পা মিলাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য—যাঁহারা দেশবিরোধী স্লোগান তুলিতেছেন, তাঁহারা পাকজঙ্গি মাসুদ আজহারের হইতেও ভয়ানক। তাঁহারা দেশভাগ করিবার চেষ্টায় আছেন। ইহা আসন্ন বিপদের সংকেত-ধ্বনি। তাই মুখ খুলিবার—প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে। কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিক কখনোই আবার দেশভাগের চেষ্টা সহ্য করিবে না।

সুভাষিতম্

সদ্বৃত্তয়ঃ প্রকাশন্তে ক্ষীয়ন্তে দুষ্প্রবৃত্তয়ঃ।
সুসংহতে সমাজে হি রমন্তে খলু দেবতাঃ।।

সুসংগঠিত সমাজে সদ্‌বৃত্তিসমূহ বিকশিত এবং দুষ্প্রবৃত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুসংগঠিত সমাজেই দেবতারা আনন্দে থাকেন।

সিতাই গণধর্ষণ : দুষ্কৃতীদের ফাঁসি চায় গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২০ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার সিতাই-য়ের ভোলাচাতরা গ্রামের গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা সমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে সবচেয়ে বেশি ভয়ের, আতঙ্কের। কারণ নিজের বাড়িকে মানুষ সবচেয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় বলে মনে করে। সিতাই-য়ে সেই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে হতদরিদ্র হিন্দু মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে দুষ্কৃতীরা গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটায়।

ঘটনার দিন লোক নৃত্যশিল্পী বলে পরিচিত দশম শ্রেণীর ছাত্রী বর্ণা বর্মন (আসল নাম নয়) পড়াশুনা শেষ করে রাতের খাবার সেরে অন্য সব দিনের মতো নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। পিতৃহীন মেয়েটির মা দিনমজুরি করে মেয়ের পড়াশুনা চালান, জীবিকা নির্বাহ করেন। ওর থাকার ঘরটির এমনই জরাজীর্ণ অবস্থা যে সেটির তুলনা কোনো রকমে ঘেরা জায়গার সঙ্গেই হতে পারে। ২০ জানুয়ারি ভোরে নিহত ছাত্রীর মা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির পাশেই কলাবাগানে গিয়ে দেখেন মেয়ের ক্ষতবিক্ষত নগ্নদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশ তদন্তে নামে। আনা হয় পুলিশ কুকুর। বুধবার রাতেই হজরত মিঞা, রফিকুল মিঞা, ওয়াশিম আক্রাম মিঞা-সহ ওই স্কুল ছাত্রীর এক বান্ধবীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে রফিকুল স্কুল ছাত্রীটির নিকটতম প্রতিবেশী। জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই স্কুল ছাত্রীর বান্ধবীকে ছেড়ে দিলেও বাকি তিন জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রের খবর, গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীরা নাকি জেরার মুখে গণধর্ষণ ও হত্যার কথা স্বীকার করেছে।

ঘটনার পরে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় ক্ষোভ বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে। ছাত্রীর পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে ও গ্রামবাসীদের ভরসা যোগাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল ভোলাচাতরায় গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বাসুদেব পাল ও সহ-প্রচার প্রমুখ সাধন কুমার পাল পৃথক ভাবে ওই গ্রামে গিয়ে নিহত ছাত্রীর পরিবারকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। গ্রামবাসীদের একটিই কথা তাঁরা দুষ্কৃতীদের ফাঁসি চান।

দুষ্কৃতীদের ফাঁসি ও মহিলাদের সুরক্ষার দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে ওই গ্রামের গৃহবধূ সন্তোষী রায় সরকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় মাতৃশক্তি জাগরণ মঞ্চ। এই মঞ্চের উদ্যোগে ওই গ্রামের মায়েদের ছয়জনের এক প্রতিনিধি দল কামদুনিতে গিয়ে মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়ালের সঙ্গে দেখা করে আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে কথা বলেন। মঞ্চের আহ্বানে মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল আগামী ৮ মার্চ ভোলাচাতরায় আসবেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ এই ঘটনা নিয়ে যারাই আন্দোলন করছেন তাদের তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকি ধমকি শুনতে হচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে নিহত ছাত্রীর বাড়িতে কারা যাতায়াত করছে এটা দেখার জন্য নাকি নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কোচবিহার জেলা বিজেপির প্রতিনিধি দল ছাড়াও রাজ্য সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভোলাচাতরায় গিয়ে সহায়তা হিসেবে নিহত ছাত্রীর দুঃস্থ পরিবারের হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন। মামলার আইনগত দিকটি খতিয়ে দেখার জন্য মাথাভাঙ্গা আদালতের আইনজীবী কৌশিক ভদ্রের নেতৃত্বে কোচবিহার বিজেপির আইনজীবী সেলের এক প্রতিনিধিদল সিতাই থানায় গিয়ে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

কলকাতায় গৌড়ীয় মঠের শতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী

সংবাদদাতা॥ গত ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামিলন উৎসব'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় এলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ তিনি বিমান বন্দর থেকে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আসেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের 'শতবর্ষ স্মারক' প্রকাশ করেন। তারপর আসেন বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের আশ্রমে। সেখানে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তির সামনে আরতি করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষে নিরাকার ও সাকার উপাসকদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অধ্যাত্মিক চেতনাই ভারতের শক্তি। নানা যুগে, নানা সময়ে বার বার আঘাত সত্ত্বেও এই আধ্যাত্মিক শক্তিই দেশকে টিকিয়ে রেখেছে।

দেশের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনদের আশঙ্কা

জেএনইউ ক্যাম্পাস স্লোগানে পাক জিহাদেরই প্রতিধ্বনি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিবেক দেবরায়, শিল্পী প্রসূন যোশী, অভিনেতা অনুপম খের প্রমুখ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন, দিল্লীর জেএনইউ-তে জঙ্গি আফজল গুরুকে শহিদ আখ্যা দিয়ে স্মরণসভার আয়োজনে যেভাবে দেশব্যাপী অস্থিরতা তৈরি করছে তা পাকিস্তানি জঙ্গি প্রধান মাসুদ আজহারের ভারত বিরোধী বিষোদ্গার থেকে মোটেই কম বিপজ্জনক নয়। একজন সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা দণ্ডিত ও সব রকমের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসা ও রাষ্ট্রপতির মৃত্যু-পরোয়ানায় সম্মতি প্রাপ্ত আসামির স্বপক্ষে কিছু বলাই যে দেশবিরোধী এমনটাই এই বিদগ্ধজনেরা মনে করছেন।

সংবাদে প্রকাশ, এই বিদ্বজ্জনদের অনেকেই বলছেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দি থেকে দেশ-বিরোধী আওয়াজ ওঠায় তাঁদের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। যদি দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে থেকে ভারতকে টুকরো টুকরো করার, তাকে ধ্বংস করার মতো স্লোগান ওঠে বা সংসদ আক্রমণকারীকে শহিদের মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয় তবে এর থেকে লজ্জাকর ও বিচলিত হয়ে পড়ার মতো বিষয় আর কী হতে পারে?

এই মর্মে দেশের তেত্রিশজন নাগরিক যাঁদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী শিল্পী, শিক্ষাবিদ রয়েছেন তাঁরা একটি যৌথ আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। তাঁরা জেএনইউ-এর ঘটনাকে দেশবিরোধী শক্তির একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বলেই আখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে আবেদনকারীদের বক্তব্য তাঁরা বিতর্ক, মতবিরোধ, সরকার বিরোধী বক্তব্যকে সাদরে গ্রহণ করতে রাজি আছেন। কিন্তু এই ধরনের দেশবিরোধী জিগির তোলা কোনো দেশপ্রেমী মানুষই বরদাস্ত করবেন না।

এই বুদ্ধিজীবীদের বয়ান অনুযায়ী কিছু লোক এই চরম নিন্দনীয় ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে বাক্‌স্বাধীনতার কথা আওড়াচ্ছেন। কীভাবে এটি বাক্‌স্বাধীনতার তকমা পেতে পারে, যেখানে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকেই এরা চ্যালেঞ্জ করছে? এই জঘন্য চক্রান্তকারীদের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক মদতদাতারা যারা এই ঘটনা ঘটিয়ে ফায়দা লুটতে চায়। আবেদনকারীরা বিতর্ক আহ্বান করার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে এ প্রশ্নও তুলেছেন, দেশকে ধ্বংস করার বিষয় নিয়ে, জঙ্গি আফজলের ফাঁসি নিয়ে কি আদৌ কোনো বিতর্কের অবকাশ আছে?

রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা এক জিনিস কিন্তু দেশের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসায় কোনো ফারাক থাকতে পারে না। আর বাস্তবে এটি কোন ধরনের আদর্শগত স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেয় যেখানে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্লোগান, দেশের সীমানার ওপার থেকে আসা শত্রুর স্লোগান আর জেএনইউ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লোগান এক সুরে বাঁধা হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় রয়েছেন প্রবীণ সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত, লোকসভার পূর্বতন সেক্রেটারি জেনারেল সুভাষ কাশ্যপ, ভূতপূর্ব মুখ্য নির্বাচনী অধিকর্তা এন গোপালস্বামীর মতো বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরতরা দেশের মেরুদণ্ড : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২২ ফেব্রুয়ারি 'রোল অফ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টস্ অ্যান্ড কোম্পানি

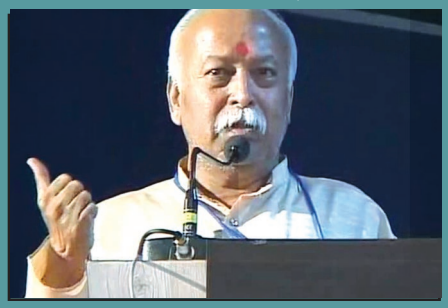

সেক্রেটারিস অ্যান্ড কস্ট অ্যাকাউনটেন্টস্ ইন নেশন বিল্ডিং' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি সকলকে মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কোল ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত এফ সিএ নীলোৎপল মজুমদার। শ্রীভাগবত জাতি নির্মাণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা কর্মরত তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'যে কোনো জাতির পক্ষে অর্থনীতি হচ্ছে মেরুদণ্ড। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, 'আমরা যদি একসঙ্গে থাকি তাহলে কেউ আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। ব্যক্তি নির্মাণই আর এস এস-এর একমাত্র কাজ। সঙ্ঘ কখনো জাতপাত ভাষা প্রদেশ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভেদাভেদ করে না। আমরা সকলে ভারতমাতার সন্তান-সন্ততি, আমরা যদি সমাজকে একত্রিত করতে পারি তাহলে আমরা জিতব। পাশাপাশি তিনি আরো জানান, হিন্দুত্বে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য রয়েছে বলে স্বীকার করে যা বিশ্বকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ। আমাদের উচিত আত্মবিশ্বাস বাড়ানো। নীলোৎপল মজুমদারের গলাতেও এরকমই বার্তা উঠে আসে।

বাংলাদেশে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ খুন

সংবাদদাতা ॥ ভারতে যখন গৌড়ীয় মঠের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তখন বাংলাদেশে মুসলমান জঙ্গিরা সেখানকার গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষকে নৃশংসভাবে খুন করে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের পঞ্চগড়

জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার পঞ্চগড়ের শ্রীশ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর দাসঅধিকারীকে নৃশংসভাবে খুন করে ও দুজনকে মারাত্মকভাবে জখম করে। এ ঘটনায় ভারত সরকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এই হত্যার প্রতিবাদে সভাসমাবেশ ও মানবশৃঙ্খল হচ্ছে। বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন এই ঘটনায় তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন এসবই বাংলাদেশে হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা।

উবাচ

“ ‘ভারত কো বরবাদ করকে রহেঙ্গে’-এর মতো ধ্বনি কোনো গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজই বরদাস্ত করবে না। ”

আধ্যাত্মিক গুরু
শ্রীশ্রীরবিশঙ্কর

দিল্লীতে ‘এক্সপ্রেস আড্ডা’-তে জেএনইউ-তে ছাত্রদের স্লোগান প্রসঙ্গে

“ আমার একটা সন্তান ছিল। আমি তাকে সেনাবাহিনীতে দিয়েছি, দেশকে দিয়েছি। আমি গর্বিত। ”

রাজবীর সিং
শহিদ ক্যাপ্টেন
পবনকুমারের পিতা

“ কুছ এনজিও সে হিসাব মাঙ্গে, সারে একট্টা হো গয়ে (কয়েকটা এনজিও-র কাছে হিসেব চাওয়া হয়েছিল, তাতেই সবাই এককাট্টা হয়ে গেছে)। ”

প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদী

ওড়িশায় কৃষকদের সভায়।

“ বাংলাদেশে কট্টর মুসলিম মৌলবাদীরা চায় না, সেখানে কোনো হিন্দু থাকুক। তাই তারা হিন্দুদের খুন করার নীতি গ্রহণ করেছে। ”

তসলিমা নাসরিন

বাংলাদেশের পঞ্চগড়ে শ্রীসন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষকে হত্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে এক ট্যুইটে।

“ রাজনৈতিক ভীতি প্রদর্শন রুখতে তারা অভ্যস্ত, এলাকার রাস্তাঘাটের মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, যেটা নির্বাচনের সময় কাজে লাগতে পারে। ”

সন্দীপ সাকসেনা

ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ মার্চের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয়বাহিনী নিয়োগ প্রসঙ্গে

বাবাকে গাধা বলার অধিকার চাই

মাননীয় চন্দ্রিল ভট্টাচার্য,

দাদা,

আপনার অনবদ্য লেখাটা পড়লাম। ১৬ ফেব্রুয়ারি যেটা প্রকাশিত হয়েছে বৃহত্তম খবরের কাগজে। 'লেঠেল দিয়ে দেশপ্রেম হয় না'।

বেশ লেগেছে দাদা। আপনি জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছেন। এই না হলে প্রগতিশীলতা! চোখ খুলে গেছে দাদা। দেশেপ্রেমের নতুন সংজ্ঞা পেলাম।

আপনি কি পুজো টুজোর সমর্থক! জানি না। হলে আপনার ফটোক লাগিয়ে ফুল-দুব্বো দিতাম।

সত্যিই তো মা-বাবাকে সম্মান করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে! কী অসাধারণ যুক্তি দিয়েছেন চন্দ্রিল্ দা! ফাটাফাটি সব তত্ত্ব খাড়া করেছেন। মাইরি বলছি, আপনার এই লেখাটা পড়ে গুরু আমি আপনার ফিদা হয়ে গেছি।

আপনি এক সময় গান লিখতেন। কী দুর্ধর্ষ সব গান! আহা! ঠাকুর দেবতা নিয়ে বিছানার অ্যাঙ্গেল। ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি। ও হো-হো-হো-হো! এখন সাংবাদিক হয়েছেন। মাঠে ময়দানে নামা সাংবাদিক নয়। ওই রোগা শরীরে সেসব সম্ভবও নয়। ঘরে বসে জ্ঞান দেওয়াই আপনার কাজ আর আপনি ফাটিয়ে দিচ্ছেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুক্তিতে। এর আগে লিখেছিলেন, সলমন খান বেশ করেছে রাস্তায় শুয়ে থাকা ভিখিরিদের গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে। ওটা কী শোয়ার জায়গা নাকি! সত্যি দাদা, ওই লেখা পড়েই আমি প্রথম জানতে পারি শুধুমাত্র নরম গদির বিছানাতেই শুতে হয়। আর মায়ের কোলে।

এই রে ভুল করে ফেললাম। আপনি তো মা-বাবা এই সব আদিখ্যেতা পছন্দই করেন না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের দেখাটা কর্তব্য মানেন কিন্তু তাতে ভালবাসা মানেন না। আর দেশ তো মা হতেই পারে না আপনার বিচারে। এমনকী কাকিমা, মাসিমাও হতে পারে না।

আমরা আবার ছোট থেকে ভুল ভাল শিখেছি কিনা! আমাদের অশিক্ষিত মাস্টাররা শিখিয়েছিল, বসুধৈব কুটুম্বকম্। প্রতিবেশী পরিবারেও যেমন মাসিমা, কাকিমাদের সম্মান করতে হবে আবার তেমনই প্রতিবেশী দেশকেও সম্মান করতে হবে। তাবলে দেশের শত্রুর নামে জিন্দাবাদ বলা চলবে না। কিন্তু আপনার কাছ থেকে শিখলাম জে এন ইউ-ই আসল শিক্ষক। সেখানকার যে ছেলেগুলোকে আমার অশিক্ষার দরুন দেশদ্রোহী মনে হচ্ছে তারাই আসল কথা জানে। জঙ্গিদের নামে জয়ধ্বনির মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত বিশ্ব-মানবিকতা।

জে এন ইউ-তে এবং সেই দেখে ল্যাজ নেড়ে কলকাতার জেইউ-তে যারা দেশের পয়সায় লেখাপড়া করে দেশবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে তাদের আপনি সমর্থন করেছেন। শুধু তাই নয়, সর্বাধিক বিক্রিত খবরের কাগজে সেকথা লিখে আপনি জনতাকে প্রভাবিত করেছেন।

আপনি বলেছেন মা পছন্দের কাজ না করলে মাকে সম্মান করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে! সন্তানকে মানুষ বা 'অমানুষ' করা তো বাপ-মার কর্তব্য! তার জন্য আবার সম্মান টম্মান চাওয়া কেন হে! জন্ম দিয়েছ, দায়িত্ব পালন করতে হবে। পছন্দ না হলে বাওয়াল করব। স্লোগান তুলব। বাপের পয়সায়, মায়ের রান্নায় খাবার খাওয়ার পরে স্লোগান তুলব, বাপ-মা নিপাত যাক। পারলে কুশ-পুতুল পোড়াব। রান্নায় নুন বেশি হলে সিবিআই তদন্ত চাইব। আইফোন কিনে না দিলে বন্ধু-বান্ধব ডেকে হার্টের পেশেন্ট বাবাকে ঘেরাও করে রাখব। তাবলে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারবে না। যদ্দিন না মরছো ভোগ কর। মরলেই সব সম্পত্তি আমার। দেশে তো একটা আইন আছে নাকি! বিদেশ হলে তো শাসন করে জেলে যেতে।

সত্যি চন্দ্রিল দা, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। আপনিই খুলে দিলেন দাদা।

কী আর এমন খারাপ করেছে জেএনইউ-এর ছাত্রদল! গণতান্ত্রিক দেশে বাক্‌স্বাধীনতা থাকবে না? বাড়িতে কোনো কিছু অপছন্দ হলে মা-বউ-বোনকে একটু গালাগাল দেওয়া যাবে না! বাপের হোটেলে খাই বলে কী বাপকে দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি! মাতাল হয়ে ফিরলে বকবে, পরীক্ষায় ফেল করলে বকবে, ব্লু-ফিল্ম দেখলে ধমকাবে, বান্ধবী পাতিয়ে পতিতা নিয়ে দিঘায় গেলে কথা শোনাবে!

সুতরাং আপনার থিওরি মতো ঠিক করছে ওরা। জেএনইউ-এর ওই ছাত্ররা। এই দেশে থেকে, খেয়ে পরে, দেশের পয়সায় পড়ে এই দেশকেই বাপ মা তুলে খিস্তি দিয়ে ঠিকই করেছে।

সবারই বাক্‌স্বাধীনতা আছে। যেমন দেশ পত্রিকায় লেখেন বলে আপনাকে দেশদ্রোহী বলা যাবে না এমন তো কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি।

আপনার ওই লেখার জন্য আপনাকে এবং আমি সমর্থন করছি বলে আমাকে কেউ যদি চিৎকার করে অমুকের ছেলে, তমুকের বাচ্চা বলে তারও স্বাধীনতা আছে।

এ পৃথিবীতে যাঁদের কুলাঙ্গার বলা হয় আপনি তাঁদের শিরোমণি। আপনার জন্য কুলাঙ্গারশ্রী পুরস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

— **সুন্দর মৌলিক**

ভারতের বামপন্থীরা চিরকালই দেশবিরোধী

সম্প্রতি একটি বেনজির বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহ কারে কয়? বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অথবা রাজপথে মিছিল করে ভারত বিরোধী স্লোগান দিলে দেশদ্রোহ নাকি হয় না। সেটা গণতান্ত্রিক বাক্‌স্বাধীনতা। তাহলে যাদের আমার বেজায় অপছন্দ তাদের প্রকাশ্যে অশালীন ভাষায় খিস্তি করাটাও আমার গণতান্ত্রিক বাক্‌স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। কমিউনিস্টরা বলছে যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রদোহ বলে কিছু হয় না। গণতন্ত্রে দেশ মাতাও নয় পিতাও নয়। গণতন্ত্র মানে যার যা খুশি করে বেড়াবার অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট নাকি দেশের কমিউনিস্টদের বলেছে যে দেশবিরোধী স্লোগান মোটেই রাষ্ট্রবিরোধী নয়। সুপ্রিম কোর্ট কবে কোনো মামলায় কী প্রসঙ্গে এমন কথা বলেছে জানা নেই। আদৌ এমন রায় দেওয়া হয়েছিল কি? যদি কোনো পাঠক জানেন তবে জানালে বাধিত হবো।

যেটা আমার জানা আছে তা হচ্ছে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধির 124A ধারায় বলা হয়েছে, ''Whoever, by words, either spoken or written with signs or by visible representations brings into hatred or Contempt towards the government established by law shall be punished with imprisonment for life...''। অর্থাৎ পাকিস্তানের পতাকা কাঁধে দলবদ্ধভাবে স্লোগান দেওয়া হয় যে ভারত তুমি কাশ্মীর ছাড়ো', 'কাশ্মীর কো আজাদ করো', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' তবে নিঃসন্দেহে তা sedition বা দেশদ্রোহিতা বলেই গণ্য হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন

গূঢ়পুরুষের কলম

দাস বলছেন যে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়ম ও আইন আছে। সেই আইনে 'দেশদ্রোহিতা' বলে কিছু নেই। ছাত্রছাত্রীদের অবাধ বাক্‌স্বাধীনতা দেওয়া আছে। তাই তারা যা খুশি স্লোগান দিতে পারে এবং দেবেও। এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সঠিকভাবেই বলেছেন, ''এখানে ক্ষমতায় থাকলে জে এন ইউ-র মতো যাদবপুরের দেশ-বিরোধীদের কলার ধরে বের করে দিতাম। সে অধ্যাপক, ছাত্র অথবা শিক্ষাকর্মী যেই হোক।'' দিলীপবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেই আমার কথা হচ্ছে এদের বিরুদ্ধে আদালতে 124A ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা উচিত। কিন্তু তৃণমূলের সরকার তা করবে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই। থাকলে মালদহে গণহত্যা এবং রাজ্যজুড়ে মুসলমান জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত হোত না। ভারতের বামপন্থীরা চিরকালই দেশবিরোধী। স্বাধীনতা লাভের পর এই কমিউনিস্টরাই বলেছিল ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গড়তে পূর্ণ মদত তারা দিয়েছিল।

এই কমিউনিস্টরাই এখন জোটের ঘোঁট পাকাচ্ছে। সঙ্গে দোসর হয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের কিছু পাণ্ডা। কমিউনিস্টরা বুঝে গেছে যে তৃণমূল সরকারের ভিতটা খুবই নড়বড়ে। এই সময়টাই জোর ধাক্কা দিলে কিছু বাড়তি আসন পাওয়া যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেসের নামগন্ধ নেই। উত্তরবঙ্গে কমিউনিস্টরা খুবই দুর্বল। তাই আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে স্রেফ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তারা জোট হোক বলে গলা ফাটাচ্ছে। জোট হলেও ক্ষমতায় তারা যে আসবে না সে কথা তারা জানে। তবে আসন সংখ্যা বাড়াতে পারলে মমতার সরকার চাপে থাকবে। সেটাই লাভের। জোট হচ্ছেই ধরে নিলে বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে বাম-কংগ্রেস জোট ১১৪-১২০টি আসন পাবে বলে আমার মনে হয়। এখানে একটা ছোট কিন্তু আছে। বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি, যেমন আর এসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সিপিএমের দাদাগিরি কতটা মানবে। যদিও আলাদাভাবে নির্বাচনে লড়লে ফ্রন্টের এই দুই মাঝারি শরিকদল রাজ্যে একটিও আসন জিতবে না। তবুও তারা চাপ সৃষ্টি করবে যতটা সম্ভব বাড়তি আসনে দলীয় প্রার্থী দিতে। সিপিএম নেতৃত্ব এই চাপ কীভাবে সামলায় সেটাই দেখার।

A Well Wisher

Dr. P. S. Chakraborty

জে এন ইউ দেশপ্রেম বনাম রাজনীতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম বিরোধী ঐক্য

দেবব্রত ঘোষ

> "রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোনো ক্ষমা নেই। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী ও মানবদ্রোহী জঙ্গিদের সমর্থন করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, তাদের ক্ষমা করা যায় না, কোনো নিয়মেই যায় না। কারণ আগে দেশ, আগে জাতি, তার পরে মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। কারণ দেশ ও জাতি বিপন্ন হলে বাকি সব অর্থহীন।"

এক শোচনীয় আত্মঘাতী সর্বনাশের ঘৃণ্য খেলায় মেতে উঠেছে কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বামপন্থী দলগুলো যাদের দোসর লালুপ্রসাদ- মুলায়ম সিং-নীতীশ কুমার, আম আদমি পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এদের কাছে প্রধান লক্ষ্য ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্র ও দেশ-বিরোধী কার্যকলাপকে সমর্থন করতেও এরা রাজি।

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে কিছু ছাত্র ভারত-বিরোধী স্লোগান দিয়েছে, পাক তথা ইসলামি জঙ্গিবাদকে সমর্থন করেছে। এই ছাত্রদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সংঘর্ষ হয়েছে এবং সঙ্গত কারণেই দেশ-বিরোধী স্লোগানরত ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এটা স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ দেশ ও জাতির সম্মান ও সুরক্ষা সর্বাগ্রে। আমাদের এই পোড়া দেশে ভারত বিরোধী স্লোগান দিলেও ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা যাবে না— এই অনৈতিক ও অযৌক্তিক দাবি কংগ্রেসের, সিপিএমের, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের, লালু-মুলায়ম-নীতীশ ও মমতার।

যে আফজল গুরু নৃশংস সন্ত্রাসবাদী, বহু নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী তাকে ফাঁসি দেওয়া অপরাধ নয়। কারণ ক্ষমা করার এবং ক্ষমা পাওয়ার একটা সীমা থাকে যা অতিক্রম করলে ক্ষমা তার মাহাত্ম্য হারায়। যারা আফজল গুরুর স্মরণে সেমিনার করে তারা দেশদ্রোহী ও মানবদ্রোহী ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং তারা কঠোর শাস্তির যোগ্য। মোদী সরকার ঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে জে এন ইউ-তে।

জে এন ইউ ক্যাম্পাসে দু'টো ঘরানা সমান্তরাল ভাবে বহমান। আগেও ছিল, এখনো তাই। একটা নেহরু ঘরানা যেটা হিন্দু ঐতিহ্য বিরোধী, আরেকটা কমিউনিস্ট ঘরানা যা হিন্দুধর্ম বিরোধী কিন্তু ইসলাম বিরোধী নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র অধিকারের নামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দেশবিরোধী স্লোগান বরদাস্ত করা যায় না। কারণ বিষবৃক্ষে জলসেচন করলে সে মহীরুহ হয়ে উঠে সমাজদেহকে বিষাক্ত করে দেয়। রাজনাথ সিং ও স্মৃতি ইরানি স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন দলের

ফঃ ২

স্বার্থে নয়, কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে নয়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যা সমকালীন প্রয়োজন শুধু নয় দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে।

উদারনীতি, ছাত্র স্বাধীনতা, ছাত্র স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার অবশ্যই মান্য কিন্তু বিদেশি জঙ্গিদের সমর্থন করে স্বাধিকারের মাত্রা লঙ্ঘন করা যায় না। এই সহজ সত্য কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধী, আপ্-এর জমিদার কেজরিওয়াল সাহেব, তৃণমূলের মালকিন মমতা, বিহারের নৈরাজ্যনায়ক লালুপ্রসাদ মানতে রাজি নন। কারণ আফজল গুরু ও তার দোসর জঙ্গিরা মুসলমান এবং মুসলমানরাই এদের ভোটব্যাঙ্ক। এই ধরনের ছাত্র রাজনীতিই দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়, লালন ও পোষণ করে। আধুনিকতার নামে, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে বিভাজনকে প্রকট করে। কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ভুল করেনি, কারণ এই ছাত্র নেতা মানবাধিকারের নামে দেশদ্রোহী স্লোগান, যা দেশদ্রোহিতার আরেক রূপ, তাকে সমর্থন করে দেশের সংবিধান, দেশের পতাকা ও দেশাত্মবোধকে বিপন্ন করেছে।

কয়েক বছর আগে আমেদাবাদে পুলিশের গুলিতে যে লস্কর-ই- তৈইবা জঙ্গিরা মারা গিয়েছিল তাদের অন্যতম ছিল মহিলা জঙ্গি ইশরাত জাহান। এই ইশরাত জাহানকে সোনিয়া-রাহুল দু'জনেই নির্দোষ নিরীহ যুবতী বলে উল্লেখ করে শহীদ সংজ্ঞায় ভূষিত করেছিলেন। কট্টর মুসলমান জঙ্গি সাজিদ মির, আবু কাফা, জাকিউর রহমানের সঙ্গে ইশরাতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তানের বংশোদ্ভূত মার্কিন লস্কর নেতা ডেভিড কোলম্যান হেডলির সাক্ষ্য তাই প্রমাণ করেছে। আমাদের দেশের বিরোধী নেতারা সোনিয়া ম্যাডাম, স্যার রাহুল, জনাব কেজরিওয়াল, মৌলানা লালুপ্রসাদ, বেগম মমতাজী এদের বিরুদ্ধে একটা শব্দও খরচ করেন না। কারণ

সামনে ভোট আসছে এবং মুসলমান ভোটটা তাঁদের চাই।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিত ভেমুলা এবং জে এন ইউ-য়ের কানহাইয়া কুমার যে নক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে, পাকিস্তানপন্থী ও ভারত বিরোধী ইসলামি জঙ্গিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে, তাকে অঙ্কুরে বিনাশ না করলে ভারতবর্ষে ইসলামপন্থী মৌলবাদ তার শাখা দ্রুত ছড়িয়ে দেবে রক্তবীজের ঝাড়ের মতো।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোনো ক্ষমা নেই। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী ও মানবদ্রোহী জঙ্গিদের সমর্থন করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের ক্ষমা করা যায় না, কোনো নিয়মেই যায় না। কারণ আগে দেশ, আগে জাতি, তার পরে মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। কারণ দেশ ও জাতি বিপন্ন হলে বাকি সব অর্থহীন।

আমাদের রাজ্যে তৃণমূল জমানায় যে ক'টি ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী খুন হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ মেয়ে হিন্দু এবং ধর্ষণকারীদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন মুসলমান। আগের চাইতে ধর্ষণের হার বেড়েছে এবং সাজানো ঘটনা বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টাও চলেছে। দুর্ভাগ্য এটাই যে রাজ্যের মুখ্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী দু'জনেই মহিলা এবং তাঁরা এ ব্যাপারে উদাসীন, যেমন উদাসীন তৃণমূলী গুণ্ডাদের হাতে পুলিশ নিগৃহীত হলে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুতে এরা উদাসীন। এরা শুধু সবাক, সোচ্চার ও সক্রিয় হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপরাধী ধরা পড়লে।

এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী চরম উদ্ধত। সাধারণ মানুষদের কাছে এদের দরজা সর্বদা বন্ধ। তথ্য সম্প্রচার বা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও পুরমন্ত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল বহনকারী ইয়েস ম্যান। অর্থমন্ত্রী মেরুদণ্ডহীন। আইনমন্ত্রী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা ও টলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রীর গুণগানে ব্যস্ত। বুদ্ধিজীবীরা মমতার গুণগানে ভাষণ দেন। মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক বই লিখে চলেন (যার আবার উর্দু অনুবাদ হয়) যার মধ্যে সার পদার্থ বলে কিছু নেই। ১ হাজার ছেলেমেয়ে চাকরি পেলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১ লক্ষ চাকরি দেওয়া হয়েছে। এই মিথ্যাচারী অপদার্থ রাজ্য সরকার দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশবিরোধী কাজের নায়কদের পাশে দাঁড়ান এবং এভাবেই এক ঘৃণধরা ও পোকায় কাটা, বিকৃত বিকলাঙ্গ বাংলার জন্ম দিচ্ছেন। কংগ্রেস-তৃণমূল-সিপিএম— এরাই তোষণ ঘরানার তিনটে ধারা। ■

অয়ম স্টার্টআপ শুভায় ভবতু

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

এক চিলতে ঘর। দেওয়ালখানা মজার। বেশ কিছু রঙিন ছবি সাঁটা। মাঝখানে একসারি কাগজের প্লেন। প্লেন বললে ভুল হবে। কতকটা রকেটের মতো দেখতে। আকাশের পানে ধেয়ে চলেছে। মেঝেতে ছড়ানো ছেটানো রংপেন্সিল, রাবার, বই-খাতা। ঘরের এক কোনে খাটো তক্তপোশ। একটা ল্যাপটপ বিছানাতে। প্রায় স্ক্রিনের ওপর উপুড় হয়ে একটা একরত্তি বাচ্চা। বয়স বারো কী তেরো। স্ক্রিনের দিকে অপলক দৃষ্টি। আর আঙুলগুলো খুব দ্রুত বিলি কেটে চলেছে টাচপ্যাডে। যেমন হয় আর কি ভিডিও গেমস্ খেলার সময়। তবে তফাত একটা আছে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে যেটা চলছে সেটা কোনো গেমস্ নয়। একটা অ্যাসট্রোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সফট্ওয়্যার। পৃথিবী থেকে চাঁদের পথে পাড়ি দিতে গেলে, কোনটার পর কি, এতেই বুঁদ হয়ে 'সাদ'। সাদ নামের ভারতের বিস্ময় বালক। এখন 'টিম ইন্ডাস'-এর ব্যস্ত সদস্য। 'টিম ইন্ডাস' হলো পৃথিবীর ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী বেসরকারি উদ্যোগ যারা মহাকাশ অভিযান আর চন্দ্র যান নির্মাণে সমর্থ হয়েছে। এমন একটা উদ্যোগ যার সদস্যদের গড় বয়স একুশ থেকে সাতাশের মধ্যে। নিজেদের ওপর বিশ্বাস আর অগাধ দেশপ্রেম। টিম ইন্ডাসের সকলেরই এক অভিব্যক্তি। চোখে আগামী স্বপ্ন আর বুকভরা দেশভক্তি। এই টিম ইন্ডাস তৈরি হয়েছে একঝাঁক তরুণ তুর্কি পেশাদারদের নিয়ে। নারায়ণের মতো সফ্টওয়্যার পেশাদার কিংবা রাহুল যোশীর মতো ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের সদ্য প্রাক্তন ফাইটার পাইলট— সকলের দিনরাত পরিশ্রম রয়েছে এর মধ্যে। এই মহাকাশযানের গতিপথ নির্ধারণ করার কাজে যারা ব্যস্ত, তাদের মধ্যে খড়গপুর আই আই টি-র প্রাক্তনী নির্মল সুরজ গড্ডে মিশন ডিজাইনের কাজে বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। এসবের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে যে এই পুরো প্রকল্পটাই কিন্তু একটা বেসরকারি উদ্যোগ। এতে মোদী সরকারের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'র স্বীকৃতি অনেক যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছে। আর সেই পথে তৈরি হচ্ছে বিনিয়োগের সম্ভাবনা--- বলেছিলেন কলকাতার ছেলে জুলিয়াস অমৃত, টিম ইন্ডাসের ইনভেস্টমেন্ট লিড।

তবে শুধু মহাকাশ নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র উন্নীত করতে এই 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'-র আহ্বান। যা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান--- এমন অনেককিছু দৈনন্দিন ক্ষেত্রের মাত্রাই পাল্টে দেবে। আবিষ্কার, প্রকল্প, উদ্যোগ বাস্তবায়নের এই প্রতিটি ধাপে দরকার আর্থিক পরিকাঠামোর। আর সেটাকেও শক্তপোক্ত করতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। আবিষ্কারের হাত ধরে যে সমস্ত নতুন নতুন উদ্যোগ উঠে আসছে তাদের আরও দ্রুত, আরও ভালভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী চার বছরে দশ হাজার কোটি টাকার সম্মিলিত পুঁজির ব্যবস্থা রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকী স্টার্টআপ উদ্যোগ থেকে অর্জিত মুনাফাকেও আগামী তিন বছর আয়কর মুক্ত রাখা হয়েছে।

মুম্বই-য়ের কর্মব্যস্ত জীবনে, দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের টিফিন ব্রেক। গরম গরম সুস্বাদু খাবার হাতের কাছে, শুধু ডাব্বার ঢাকনা খোলার অপেক্ষা। কয়েক হাজার ডাব্বাওয়ালাদের কাঁধে কিংবা মাথায় চেপে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে দুপুরবেলার খাবার পৌঁছে যায় নির্ভুল ঠিকানায়। মুম্বই-য়ের ডাব্বাওয়ালাদের এই কাজের পদ্ধতি আজ সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে। এরই আধুনিক ব্যবস্থিত সংস্করণ হলো 'এম কে ডাব্বাওয়ালা' উদ্যোগী। পুণে, ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদ এমন বেশ কয়েকটি শহরে শুরু হয়েছে এই পরিষেবা। মোবাইলের অ্যাপসে কিংবা ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে ঠিক ঠিক সময়ে অর্ডার করলে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি থেকে শুরু করে পরোটা কিংবা বড়াপাউ। আবার টিফিনের জন্য স্যান্ডুইচ কিংবা আচার সহযোগে নিমকি। শেষ পাতে মিষ্টিমুখ করতে গাজরের হালুয়া, পায়েস কিংবা সন্দেশ সবই মিলতে পারে। মোবাইলে অর্ডার দিন আর সেই খাবার আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ডাব্বার মধ্যে। খুব তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে এমনই আশা ব্যক্ত করেন সংস্থার কর্ণধার পল্লবী গুপ্ত। বাড়ির খাবার থেকে বঞ্চিত হবে না কেউই এটাই পল্লবীর ইচ্ছা।

'এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই'— সুমনের এই গানের রেশ ধরে অন্তত এইটুকু তো বলা যায় 'এক কাপ চা— আমি তোমাকে চাই'। শুধু বাঙালি নয় ভারতবর্ষের সর্বত্রই চায়ের সমাদর। পানীয় হিসাবে ধরতে গেলে জলের পরেই সবচেয়ে বেশি চা খাওয়ার চল।

সাদ

জুলিয়াস অমৃত

আমুলিক সিং বিজরাল

কাজের চাপে বা অবসরে, সকালের জলখাবারে কিংবা বিকেলের আড্ডায় চা কিন্তু চাই-ই চাই। তাই চা তৃষ্ণার্তের হাতে ঠিকঠাক এক কাপ চা যাতে যে-কোনো সময় বা জায়গায় পৌঁছে যায় এটাই 'চায় পয়েন্ট'-এর লক্ষ্য। এই অভিনব চিন্তা যে মানুষটির মাথায় আসে তার নাম— আমুলিক সিং বিজরাল। আপনাকে শুধু জানিয়ে দিতে হবে আপনি কোথায়, আর কীরকম চা আপনার পছন্দ। যথা সময়ে, ফ্লাস্কে ভরে চা পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। চলতে চলতে চা— এইরকম একটা চিন্তাভাবনা থেকেই শুরু। হার্ভার্ড বিসনেস স্কুল থেকে স্নাতক আমুলিকের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের চুরাশি কোটি মানুষ চা পানে অভ্যস্ত। কিন্তু তৈরি করা চায়ের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মান, পরিচ্ছন্নতা আর দাম এগুলোর কোনোটাই ঠিকঠাক ছিল না। তাই এই ব্যবসার সূত্রপাত।

বছর পাঁচেকের কচি-কাঁচাদের ভিড়। একপাশে দাঁড়িয়ে ঐশী। হাত দু'টো দিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে থাকা টিফিন-বক্স। এটা তার মূল্যবান সম্পত্তিগুলোর মধ্যে একটা। প্যাঁচা, ইঁদুর, হাঁস, ময়ূর— দুর্গা ঠাকুরের সব বাহনগুলোর ছবি তার টিফিন বক্স জুড়ে। শুধু তাই নয়, তার এমন একটা জামা আছে যার পুরোটা জুড়ে রয়েছে ছোট-বড় রাজস্থানী পুতুল। শুধু ঐশী নয়, ঐশীর মা, তার পিসতুতো ভাই, এমনকী তার জেঠুমণি প্রত্যেকেরই এমন কিছু প্রিয় জিনিস আছে যা একই সঙ্গে সৃজনশীল আবার ভারতীয় লোকায়ত্ত শিল্পের খুব কাছাকাছি। জামা, জুতো, খাতা, পেনস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে কফি কাপ কিংবা ফ্রিজ ম্যাগনেট এমন হরেক কিসিমের একটা অনলাইন দোকান হলো 'চুম্বক'। দেশীয় স্বাদের আর আন্তর্জাতিক মানের এমন বহুরকম জিনিস পাওয়া যায় 'চুম্বকে'। এই উদ্যোগ যার মস্তিষ্ক প্রসূত তিনি হলেন— শুভ্রা চাড্ডা। আর পাঁচটা ছাপোষা রোজগেরে গিন্নির মতো বেশ চলে যাচ্ছিল শুভ্রার। কাজের ফাঁকে বেড়াতে যাওয়াই ছিল তার একমাত্র শখ। আর বেড়াতে গেলে আমরা যা করি আর কি, বাড়ির লোকজন প্রিয় বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন— সকলের জন্যই প্রায় টুকিটাকি কিছু না কিছু উপহার কিনে নিয়ে আসি— বলছিলেন শুভ্রা। আর এই থেকেই মাথায় আসে ব্যাপারটা। নতুন ব্যবসা— নাম 'চুম্বক'। কাপ-ডিস,

সূচী মুখার্জী

জুতো-জামা মায় পাপোস পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে যেমনটা আর পাঁচ জায়গায় দেখা যায়, তার চেয়ে এর রং, দৃষ্টিনান্দনিকতা একদম আলাদা। দোকান আর অনলাইনের মাধ্যমে এই নতুন ব্যবসাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া--- এইসব ধ্যানজ্ঞান। এমনকী পাগলামিটা এমন পর্যায়ের ছিল যে শুরুর মূলধনের ব্যবস্থা করতে নিজেদের বসত বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করতে পিছপা হননি। চুম্বক তাই 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার' অন্যতম আকর্ষণ।

যতই দিন যাচ্ছে, খাদ্য, জল, অক্সিজেনের মতোই আর একটা জিনিস অত্যাবশ্যকীয় তালিকায় ঢুকে পড়ছে। তা হলো ইন্টারনেট। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিষেবা এমনসব দৈনন্দিন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার হয়ে পড়েছে অবশ্যম্ভাবী। আর তাই শহর থেকে শহরতলি, সদর থেকে গ্রাম— কম্পিউটার বা মোবাইল হাতে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া অচল। কিন্তু এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যা ভৌগোলিক কারণে হোক বা পরিকাঠামোর অভাবে— সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেই মুশকিল আসানের লক্ষ্যে হাত বাড়িয়েছে 'সাংখ্য ল্যাব'। পরাগ নায়েক, হেমন্ত মল্লপুর আর বিশ্বকুমার— মূলত এদের নেতৃত্বেই এগিয়ে চলেছে এই ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানটি। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে এদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম 'ধনুষ'। যা বেতার মাধ্যমে ইন্টারনেটকে ছড়িয়ে দেবে বহুদূর পর্যন্ত। দেখা গেছে একটা 'ধনুষ' বেস স্টেশন যন্ত্র ১০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত কয়েকশো মানুষের কাছে উচ্চশক্তির ইন্টারনেট সরবরাহ করতে সক্ষম, যার পোশাকি নাম 'মেঘদূত'। আরও মজার বিষয় যে এই ধনুষ যন্ত্রটি সৌরশক্তির মাধ্যমেও দিব্যি চলতে পারে। আবিষ্কারের সাফল্য বা প্রযুক্তির উৎকর্ষতা নিয়ে 'সাংখ্য ল্যাব'-য়ের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। মাইক্রোসফ্‌ট, গুগল, ফেসবুক-য়ের সঙ্গে প্রযুক্তিগত তালমিল তো রয়েছেই, এমনকী ইসরো-র তৈরি জিএসএটি-৬ স্যাটেলাইটের যে রিসিভার যন্ত্র তাও তৈরি হয়েছে 'সাংখ্য ল্যাব'-য়ের সহায়তায়। কর্ণাটকের প্রত্যন্ত গ্রামের দাওয়ায় বেতার (wi-fi) ইন্টারনেটের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করতে করতেই বেশ প্রত্যয়ী গলায় পরাগকে বলতে শোনা গেল— 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া তো মেক ইন ইন্ডিয়া হতেই পারে, কারণ আমাদের এই সব প্রযুক্তিই তো মেড ইন ব্যাঙ্গালুরু'। ততক্ষণে একটা কাঠের বাক্সের ওপর ল্যাপটপে কাজে ব্যস্ত পাশে বসা এক গাঁয়ের বধু।

আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ের ছাত্রসংখ্যা নেহাত মন্দ নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে তাদের অনেকেরই হাতে কলমে কাজ করার ব্যাপারটা বেশ দুর্বল। পুঁথিগত ভাবে হয়তো সমস্যার সমাধানগুলো জানা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগের উপায়টা বড়ই নড়বড়ে। তাই হাত-মাথা সড়গড় করে নেওয়ার জন্য এক অভিনব উদ্যোগ 'মেকার্স অ্যাসাইলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি বা কাজের ফাঁকফোকরে এখানে জড়ো হয় সকলে। তাও আবার কাজ করতে, কাজ শিখতেও বটে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা সব ধরনেরই পড়ুয়ার জমায়েত এখানে। এখানে একজনের ভাবনা মিলে যায় অন্যজনের প্রযুক্তিতে, আবার সেই প্রযুক্তির রূপ পায় কারুর কর্মকুশলতায়। মোটের ওপর এটা একটা যন্তরমন্তর আড্ডাখানা। কাজকর্মের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজ- সরঞ্জাম ও উন্নত প্রযুক্তির পরিকাঠামো একদম হাতের নাগালে। তাই একা হোক বা সমবেতভাবে কাজে লেগে পড় লেই হলো। পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি— বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বৈভব ছাবরার জীবন্ত স্বপ্ন এই প্রতিষ্ঠান। স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মূলশক্তি যে 'আবিষ্কার'—এ যেন তারই আতুড়ঘর।

'রোবট' কথাটা শুনলেই যেন ধাতব হাত পা-ওলা যন্ত্রমানবের ছবি ভেসে ওঠে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা— তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে পড়ে আলাদিনের জিনের মতো। কোনো বেজার বিরক্তি নেই। সময় কোহলির সংস্থা 'গ্রে অরেঞ্জ' সেই রোবটই তৈরি করছে— তা

আবার ভারতবর্ষেই। গুরগাঁও-এর এই সংস্থার রোবট দেখতে অনেকটা ছোট টুলের মতো। যেটা নির্দেশ মতো গড়গড় করে চলে যেতে পারে একটা কারখানা বা গুদামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ধরা যাক একটা গুদামের বিভিন্ন কোণে থাকা বিভিন্ন সেল্ফ-এর এক একটি তাকে এক এক রকম জিনিস রয়েছে। এই রোবট বা বাটলারকে যদি ঠিকঠাক আদেশ করা যায় তবে ফর্দ মিলিয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে ঠিক ঠিক জিনিস পৌঁছে দেবে ঠিকঠাক জায়গায়। শুধু তাই-ই নয়, বাকি জিনিসের হিসাবপত্র করে ও জানিয়ে দেবে কোন্‌টা, কতটা আর কোথায়ই বা আছে। মজার ব্যাপার হলো, ব্যাটারি চালিত এই রোবট চার্জ ফুরিয়ে এসেছে বুঝতে পারলে নিজে নিজেই পৌঁছে যাবে আবার চার্জ করার জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই ভারতীয় রোবটের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালি মুখার্জি পরিবারের মেয়ে শুচি। মেধাবী ছাত্রী। স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো। তারপর বেশ কটা নামি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি। বছর দু-তিনেক আগে দেশে ফেরা ইস্তক নতুন কিছু একটা করার ইচ্ছা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। ভরসা করে একদিন মাকে বলেও ফেলে— একটা ব্যবসা করলে কেমন হয়? মায়ের মুখ থেকে একটাই স্বর বেরিয়েছিল 'সর্বনাশ'। কিন্তু সেও দমবার পাত্রী নয়। একঝাঁক দ্বিধাদ্বন্দ্বকে পেছনে ফেলে শুরু করে দেয় নতুন উদ্যোগ 'লাইম রোড'-য়ের কাজ। মহিলাদের পরিধান থেকে প্রসাধন এমনকী গৃহশোভার পসরা নিয়ে অনলাইনের বাজার এই 'লাইম রোড'। বিশ্ব বাজারে অনূর্ধ চল্লিশ মহিলা উদ্যোগীদের মধ্যে শুচির নাম প্রথম সারিতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়ষী প্রশংসা করে তিনি বলেন, লন্ডন যা করে দেখাতে পারেনি, স্টার্টআপ-য়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তা করে দেখিয়েছে।

দাদু, জেঠু-র পর যখন বাবারও সুগার ধরা পড়ল তখন বেশ গভীর একটা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল চন্দ্রা। চায়ের কাপে চিনিটা দিতে গিয়েও চামচ সরিয়ে নিল। চামচটা ঝাঁকিয়ে বেশিরভাগটাই ঝেড়ে নেয় চিনির ডিবেতে। তারপর নমো নমো করে একটুখানি নেয় চায়ের কাপে। এতে মন তো ভরলই না, বরং সুগারের ভয়টা রয়েই গেল। আজকাল আকছার তো

পল্লবী

পরাগ নায়েক

শুভ্রা চাড্ডা

নির্মল সুরজ গড্ডে

এমন ঘটনা ঘটছেই চারপাশে। বংশগতভাবে যে রোগগুলো পরম্পরায় চলে আসছে সেটা আটকানো বা নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা উপায় বেরিয়েছে। যার নাম 'জিনোমপত্রি'। কতকটা জনমপত্রির মতো শুনতে লাগলেও ব্যাপারটা আলাদা। 'ম্যাপ মাই জিনোম' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অনুরাধা আচার্য-র কথায়--- পদ্ধতিটির মধ্যে তেমন একটা ঝামেলা নেই। আমরা যে কেউই মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে এই পরিষেবায় অনুরোধ জানাতে পারি। ওই সংস্থার একজন প্রতিনিধি একটা বাক্স পৌঁছে দেবে আপনার কাছে। তাতে একটা টুথব্রাশের মতো একটা জিনিস থাকে। মুখের মধ্যে দাঁত মাজার মতো কিছুক্ষণ করে সেটা আবার বাক্সের মধ্যে করে ফেরত দিতে হয়। এবার ম্যাপ মাই জিনোম-য়ের ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন ধাপে ডি এন এ পরীক্ষার মাধ্যমে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি হয়, যা আপনাকে সম্ভাব্য রোগের প্রবণতা অনুযায়ী আগাম সতর্ক করবে। এবার সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে ডাক্তার তার ডায়েবিটিস স্থির করে দেবে সঠিক ওষুধ আর পথ্য। তাই শরীরের সুস্থতা আর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর— স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মঞ্চে এই ছিল অনুরাধার মূল বক্তব্য।

তাই বহির্বিশ্বে মহাকাশযান থেকে শুরু করে মানবদেহের অভ্যন্তরে জিনোম— স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার পরিধি থেকে বাদ পড়েনি কেউই। উদ্যোগীর অধ্যবসায়ই উদ্যোগের মূলধন। ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় দিল্লীর বিজ্ঞানভবনে 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত হন, ঘড়ির কাঁটা তখন ছটা ছুঁই ছুঁই। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সকলকে মনে করিয়ে দেন 'আজ শনিবার। সাধারণত সরকারি ছুটির দিন। তাও আবার সন্ধে ছ'টা। এতো প্রশ্নই ওঠে না।' রসিকতার আমেজ ছড়িয়ে পড়ে সভাগৃহে। একপশলা হাসির রোল আর হাততালি থামলে সকলের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন 'কেউ যদি এখনও জিজ্ঞাসা করে তফাতটা কী? তবে তার উত্তর এটাই'।

শুধু কথায় নয়, কর্মসংস্কৃতির যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে বিজ্ঞানভবনের কোণায় কোণায় তা চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের পর নিজেদের মতো আলাপচারিতা, খুচরো গল্প। কারুর মুখে হার্ভার্ড বিসনেস স্কুল স্নাতক থেকে চা-ওয়ালা হওয়ার গল্প, কারুর বা চা-ওয়ালা থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার— এই নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ চলল 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'-র 'চায়ে পে চর্চা'। ■

উদ্ভাবনী প্রতিভাতে ভরসা রাখতে চান প্রধানমন্ত্রী

স্টার্টআপের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে তাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোগপতিদের একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

বেশ বছর কয়েক আগেকার কথা। মুম্বই আই আই টি থেকে স্নাতক হওয়া এক যুবক চা-কফি রেস্তঁরার 'চেন' ব্যবসা খুলবেন বলে তাঁর মোটা মাইনের পেশাদার পরামর্শদাতার চাকরি ছেড়ে দিলেন। তাঁর ব্যবসায়ী বাবার মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! সম্মানের পেশাদারি চাকরি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত কিনা চা-কফির দোকান! লোকে কী বলবে? ছেলের অবশ্য এসব নিয়ে বিশেষ একটা মাথাব্যথা ছিল না। তাই আজ ভারতের বড় বড় শহরে নিজের মালিকানায় কুড়িটির মতো রেস্তঁরা নিয়ে একজন উদীয়মান উদ্যোগপতি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছেন। এখন তাঁর উদ্যোগে টাকা ঢালার জন্য লোকে বসে আছে। শান্তনু দেশপাণ্ডে। বছর ২৯-এর দিল্লীর যুবক, একটি নামি প্রতিষ্ঠানের ব্যস্ততার চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'অনলাইনে' চুল-দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। রেজর, ব্লেড, ক্রিম, ব্রাশ, ক্ষৌরকর্মের প্রসাধনী থেকে তোয়ালে কী নেই তাঁর ব্যবসায়! একজন স্কুলের বন্ধু আর আগের প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী সমেত চারজন মিলে শুরুতে মুম্বই, দিল্লী ও বেঙ্গালুরুতে এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যেই বড় বড় সংস্থার কর্ণধার থেকে বেসরকারি পুঁজিপতি মিলিয়ে ২৩ জন তাঁদের ব্যবসায় প্রায় ১৩ কোটি টাকার পুঁজি ঢেলেছেন। আত্মপ্রত্যয়ী দেশপাণ্ডের মতে প্রতি বছর প্রায় ২৫ কোটির মতো মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছেন। তাঁরাই তাঁর মালের সম্ভাব্য ক্রেতা। বছর দুয়েক আগে দিল্লীর তরুণ পুনীত কাপুর তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে 'অনলাইনে' খুচরো ওষুধ বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। 'বিগকেমিস্ট' নামে পরিচিত সংস্থাটি এখন প্রতিদিন কমবেশি ২০০টির মতো বরাত পায় যার প্রতিটির মূল্য গড়ে ৭০০ টাকা। পুনে কেন্দ্রিক 'টেকইনোভেন্স' সংস্থার সাফল্যের ইতিহাস মাত্র চার বছরের। বড় বড় বাড়িতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম জোড়ার কাজ করে তারা। মাত্র ২৫ বছরের দু'জন যুবকের হাতে গড়া এই সংস্থার আয় এখন বছরে ২ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে দাঁড়িয়ে এইসব তরুণ উদ্যোগপতিদের তালিকা এতটাই লম্বা যে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন এইসব যুবক-যুবতীরা প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে দিয়ে ব্যবসার জগতে নতুন পথের সন্ধান দিতে পেরেছেন। তাঁদের এই আপাত জটিল ধারণা-সমৃদ্ধ ক্ষেত্র আজ 'স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম' নামে পরিচিত হয়েছে। যদিও এই সমস্ত ধারণা আমেরিকায় সফল ব্যবসার আদলে তৈরি, তবু ভারতীয় পরিবেশে সফল হবার জন্য তাঁরা তাঁদের ব্যবসাকে মানানসই করে নিয়েছেন।

আমেরিকায় প্রবাসকালে ভারতের পুনর্জাগরণ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, 'তরুণ প্রজন্মের উপর আমার ভরসা রয়েছে। এদের মধ্যে থেকেই আমি কাজের লোক খুঁজে পাব যারা সিংহ-বিক্রমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য স্পষ্ট। আমি যদি সফল না হই তবে আমার পরে আরোও ভালো কাজের লোক কেউ আসবেন আর আমি লড়াই করেই সন্তুষ্ট থাকবো'। যুবকদের উদ্দেশ্যে আরোও বলেছিলেন, 'আমাকে বিশ্বাস করার যদি হিম্মত থাকে তবে তোমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। প্রত্যেকে মনে এমন বিশ্বাস আনো যে তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই অসীম শক্তি রয়েছে যা দিয়ে তোমরা ভারতকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারো'। ভারতের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার পর প্রায় সাতদশক ধরে দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার মতো এমন একটি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দেখা মেলেনি। অথচ যুগ যুগ ধরে ভারতীয়দের ঝুঁকিহীন সুখীজীবনের অভ্যাসটাই বদলে দিতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করার জন্য দেশে সক্রিয় তরুণ উদ্যোগপতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। সেদিক থেকে ২০১৪ সাল সেই যুগসন্ধিক্ষণ যখন দেশ এমন এক নেতৃত্ব পেয়েছে যা তরুণ- সমাজকে স্বাভিমানী আর স্বনির্ভর হতে স্বপ্ন দেখাতে পারে।

কয়েক দশক আগেও সরকারি চাকরি অনেকের কাছেই স্বপ্নের পেশা ছিল। পরে পরে বেসরকারি চাকরি জনপ্রিয়তা পায়। অনেকে

এমনকী সরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিত। কিন্তু বিশ্বমন্দার আবহে অনেক সংস্থাই পরিবর্তিত বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে কর্মী সংকোচনের পথে যেতে বাধ্য হয়। আজকের 'স্টার্ট আপ' দুনিয়া অনেকটা তারই ফলশ্রুতি। একজন সফল উদ্যোগপতি ২০০০ সালে শুরু করা তাঁর উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি যখন তাঁর 'স্টার্টআপ' ব্যবসা তৈরি করেন তখন এটা খুব একটা ভালো ভাবনা বলে লোকে মানতো না। আজকে এমন একটা ব্যবসা গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় তরুণ উদ্যোগপতিদের মধ্যে আজ ব্যবসা জগতের মানচিত্রে পায়ের ছাপ পড়েনি এমন সমস্ত ক্ষেত্রে যাবার অসীম উৎসাহ রয়েছে। ব্যবসা শব্দটার প্রতি ভারতীয়দের যে সহজাত অনীহা আর তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল তা ক্রমশ একটা সম্ভ্রম ও অনুপ্রেরণায় বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন ধারণা আর কাজের মধ্যে দিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর 'স্যুট-বুটের' ধনকুবেরদের দরকার নেই। ২০ থেকে ৩০ বছরের সাধাসিধে, গতে বাঁধা ছক ভাঙার দম আছে এমন তরুণ- তরুণীদের আজ দেশের প্রয়োজন। ব্যর্থ হবার ভয়ে এরা পিছিয়ে আসে না। সুখী জীবনের ধারণা এদের সঙ্গে মানায় না, বরং খ্যাপাটে, বিরামহীন অভিযান দিয়ে এরা অনপনেয় দাগ রেখে যায়। তাদের কাছে স্থায়ী চাকরি নেবার সম্ভাবনা বা পরামর্শ একটা দম বন্ধ করা সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। তরুণদের মধ্যে এমনই এক মনোভাব জাগাতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। জীবিকার ধারণা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নতুন কিছু যাচাই করে দেখার মানসিকতা রয়েছে। পরিবারও এঁদের এগিয়ে দিচ্ছে। ঝুঁকির উদ্যোগ ভালোরকম দাম পাচ্ছে। প্রতিদিন ভারতে তিন থেকে চারটে 'স্টার্টআপ' জন্ম নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে উন্নত দুনিয়ার সমৃদ্ধির পেছনে 'স্টার্টআপ'-এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কেননা এদের মাধ্যমে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিগত এক দশকে ভারতে বেকারত্বের হার ৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালের প্রকাশিত শুমারির প্রতিবেদন অনুসারে উৎপাদন ক্ষেত্রের গতি থমকে যাবার কারণে চিরাচরিত ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না এবং পরিস্থিতির আশু উন্নতি হবার কোনো লক্ষণ নেই।

এমন অবস্থায় স্টার্টআপকে ভারতে মধ্যবিত্ত সমাজে কর্মসংস্থানের সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে ভাবা হচ্ছে। ধারেভারে ২০১৫ সাল স্টার্টআপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, এবছর প্রযুক্তিক্ষেত্রে ১২০০-র মতো স্টার্টআপ শুরু হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। বিনিয়োগকারীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুণ হয়েছে। এযাবৎ ভারত প্রযুক্তিক্ষেত্রে মোট ৪২০০ স্টার্টআপ উদ্যোগ আর

স্টার্টআপ-এর ১৩টি ধাপ

(১) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের পোর্টাল থেকে অনলাইনে ডাইরেক্ট আইডেনটিফিকেশন নাম্বার (DIN) সংগ্রহ করতে হবে। ১০০ টাকা ফি দিয়ে তা একদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

(২) তিনদিনের মধ্যে ১৫০০ টাকা দিয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে ডিজিটাল সই শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

(৩) কোম্পানি নিবন্ধকের (ROC) কাছে অনলাইনে কোম্পানির নাম নথিভুক্ত করতে দু'দিন সময় লাগবে আর খরচ হবে ৫০০ টাকা।

(৪) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোষাগার বা অনুমোদিত ব্যাঙ্ক থেকে কোম্পানি বিষয়ক নথিপত্র সিলমোহর করিয়ে নেওয়া যাবে মাত্র একদিনে। খরচ হবে মাত্র ১৩০০ টাকা।

(৫) কোম্পানি নিবন্ধকের কাছ থেকে মাত্র ৫ দিনের মধ্যে ১৪ হাজার ১৩৩ টাকার বিনিময়ে কোম্পানি নিগমবদ্ধ শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

(৬) ৩৫০ টাকার বিনিময়ে একদিনের মধ্যে সিলমোহর বানানো যাবে।

(৭) এক সপ্তাহের মধ্যে ৬৭ টাকার বিনিময়ে স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (PAN) পাওয়া যাবে।

(৮) আয়ের উৎসমূলে কর আদায়ের জন্য আয়কর দপ্তরের আধিকারিকের কাছ থেকে মাত্র ৫৭ টাকার বিনিময়ে এক সপ্তাহের মধ্যে মিলবে কর অ্যাকাউন্ট নম্বর (TAN) ।

(৯) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পৌরসংস্থার দোকান ও কারবার পরিদর্শকের কাছে সংস্থার অফিস নথিবদ্ধ করতে হবে। সময় লাগবে ২ দিন, খরচ হবে ৬৫০০ টাকা।

(১০) বারো দিনের মধ্যে রাজ্যের বাণিজ্যিক কর অফিসে যুক্ত মূল্য করের (VAT) জন্য নথিভুক্ত হওয়া যাবে। খরচ হবে ৫১০০ টাকা।

(১১) দু'দিনের মধ্যে বিনা খরচে বৃত্তিকরের জন্য নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

(১২) বিনামূল্যে কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড সংস্থার নাম নিবন্ধন করতে হবে। সময় নেবে সর্বাধিক ১২ দিন।

(১৩) কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম-এর আঞ্চলিক অফিসে চিকিৎসা বীমার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে হবে। কোনো খরচ নেই।

৫ থেকে ৬.৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার বিনিয়োগ নিয়ে ইজরায়েল ও চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। 'শাদি ডট্ কম', 'মাখন ডট্ কম' ইত্যাদির মতো চল্লিশটি স্টার্টআপে সফল বিনিয়োগকারী অনুপম মিত্তল মনে করেন যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম 'ইন্টারনেট' বাজার যেখানে বহু বিচক্ষণ ক্রেতা এর মাধ্যমে কেনাকাটা করার জন্য তৈরি আছে। ২০১৭ সাল নাগাদ ভারতে সম্ভাব্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৩১ কোটির মতো যেটা ইকমার্স ব্যবসায় অন্যতম প্রেরণা জোগাচ্ছে। ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিল-এর মতো বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপের সাফল্যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভারতীয় স্টার্টআপে বিনিয়োগ করার উত্তরোত্তর খিদে দেখা যাচ্ছে। স্ন্যাপডিল-এর কুণালভাই ও রোহিত বনশাল, ফ্লিপকার্টের সচীন বনশাল ও বিন্নী বনশাল, পেটিএমের বিজয় শেখর শর্মা, ওলা ক্যাব-এর ভবিষ্যৎ অগ্রওয়াল ও অঙ্কিত ভাটি— এঁরা যেন আধুনিক ভারতের মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছেন যাতে আজকের প্রজন্মের বহু তরুণ-তরুণী এধরনের কাজে আকৃষ্ট হচ্ছে। জীবনের সবক্ষেত্রে আজ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের সুফলকে কাজে লাগিয়ে প্রথাগত ব্যবসার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এবং দক্ষতার সঙ্গে স্টার্টআপ ব্যবসা তাদের পরিষেবা দিতে পারছে, যার ফলে ব্যবসার জগতে একটা বড় ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মুম্বই আই আই টির বিশাল চত্বরে 'সোসাইটি ফর ইনোভেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিনিউয়ারশিপ' (SINE) স্টার্টআপ-এর স্বপ্নকে বড় করে তুলছে। কম দামের বৈদ্যুতিন ব্রেইলি পদ্ধতি যাকে সহজেই স্মার্ট ফোন আর ট্যাবলেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় এমন একটি স্টার্টআপ শুরু করতে সেখানকার স্নাতক, শ্যাম শাহ্ ও সুরভী শ্রীবাস্তব-কে' 'সাইন' ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। ২০০৪ সালে জন্ম নেওয়া 'সাইন' এ পর্যন্ত ৭৩টি স্টার্টআপ তৈরিতে সাহায্য করেছে সেই সঙ্গে মুম্বই আই আই টি চত্বরে তারা ২৫টির মতো স্টার্টআপকে সহায়তা দান করছে। ভারতে এই উদ্যোগের সিংহভাগই বেঙ্গালুরুতে কেন্দ্রীভূত। তার কারণও রয়েছে। ন'য়ের দশকে ইনফোসিস, ইউপ্রো-র মতো নামি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির ধাত্রীভূমি ছিল বেঙ্গালুরু। আমেরিকার এক গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে বৃদ্ধির সূচক অনুসারে বার্লিনের পর বেঙ্গালুরু দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পুনেভিত্তিক, 'ইকোজেন সলিউশন্স্' একটি কম খরচের হিমঘর ব্যবস্থা চালু করেছে যার ফলে কৃষকদের ফসলের অপচয় ৩০ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

আজ স্টার্টআপ ধারণার আলোড়ন ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। শিল্পের দরজা খুলে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাধাহীনভাবে বাড়তে দিয়ে আর্থিক সমৃদ্ধির যে স্বপ্ন নিয়ে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, বিরোধী রাজনীতির কদর্যতায় তা আজও সম্ভাবনার সবুজ কুঁড়িতেই রয়ে গেছে। অথচ উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে স্টার্টআপ যে একটি অপরিহার্য অনুঘটক তা বুঝতে পারছে এই সরকার। সে কারণে বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে একে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে প্রয়োজন সরকারি স্তরে সহায়তা। কারবারি উদ্যোগকে উৎসাহ দেবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং স্টার্টআপে অর্থের যোগান বাড়াতে ২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেন। ২০১৬-র ১৬ জানুয়ারি দিনটিকে সরকার 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া'-র জন্য উৎসর্গ করেন। নতুন উদ্যোগ তৈরিতে সহায়তা করা আর পুরানো উদ্যোগগুলি যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে তার প্রক্রিয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন উদ্যোগপতি, বিনিয়োগকারি ঝুঁকি প্রকল্পে অর্থ যোগানদারদের সঠিক সময়ে ও সঠিক জায়গায় প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরিষেবা দেওয়া এবং মনোবল বাড়াতে সবধরনের সাহায্য দেবার অঙ্গীকার করেছে সরকার। এর অঙ্গ হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের বিভিন্ন ধারাগুলিকে সরল করে দু'পাতার স্টার্টআপ আইন তৈরি করা হয়েছে। এখন মাত্র ১৩টি সহজ ধাপে ভারতে নতুন কারবার শুরু করা যাবে।

এর সঙ্গে প্রকল্প রূপায়ণ পরিকল্পনার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ঘোষণা করা হয়েছে।

এক : স্টার্টআপকে শ্রম ও পরিবেশ সংক্রান্ত ৯টি আইন অবশ্যই পালন করতে হবে, তবে পরিদর্শন সংক্রান্ত ঝামেলা পোয়াতে হবে না, যাতে তারা আরোও খোলামনে উপভোক্তা পরিষেবা দিতে পারে।

দুই : বাজার থেকে অর্থসংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মনীতি অনেক শিথিল করা হবে।

তিন : ঝুঁকি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের অর্থের পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থ যোগান দেবার জন্য ২০১৪ সালে ২০০০ কোটি টাকার ইন্ডিয়া অ্যাসপিরেশন্ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে।

চার : চলতি মূলধনের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন, ভালো কাজের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমেও অর্থ পাওয়া যাবে।

পাঁচ : মূলধনী লাভ থেকে কর ছাড় পাওয়া যাবে।

ছয় : শুরু থেকে ৫ বছর সময় কালের মধ্যে প্রথম তিন বছরে আয়ের উৎসমূলে কর কাটা হবে না। এর ফলে শুরুতেই অর্থের যোগান অযথা আটকে না থেকে স্টার্টআপগুলি আরোও ভালোভাবে চলতে পারবে।

সাত : স্টার্টআপের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী কেন্দ্রগুলিকেও কর ছাড়ের আওতায় আনা হবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, অসফল প্রকল্পগুলিও সমান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে, কেননা এগুলি থেকেও যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে।

প্রতিশ্রুতি মতোই সরকার দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কর্তব্য পালন করেছে। রূপায়ণ পরিকল্পনার প্রতিটি উদ্যোগই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে সুদৃঢ় করা এবং উদ্ভাবনী প্রতিভাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে। এককথায় নিজেদের এবং অন্যদের জন্য সৃজনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এটা একটা অভাবনীয় সুযোগ বলা যেতে পারে। স্টার্টআপের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে তাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোগপতিদের একযোগে কাজ করে যেতে হবে। ■

চিঠিপত্র

বাংলার পরিবর্তন

২০১১ সাল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সময়। বাংলার মানুষ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল জনাদেশের দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী করেন। বাংলায় আসে পরিবর্তন। এই সরকার গঠনে মুসলমান ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই ভোটের বড় অংশ বর্তমান শাসক দলের পক্ষে যায়। বর্তমান সরকার রাজ্যের ২৭ শতাংশ মুসলমান ভোটে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে তোষণের বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করে। ইমাম ভাতা প্রদান তার অন্যতম। যদিও এখানে বলা দরকার সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষায় ভারতের সব সরকার দায়বদ্ধ। সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী নাজমা হেপ্তুল্লা মোদী সরকারের অন্যতম সফল মন্ত্রী। কিন্তু উন্নয়ন আর তোষণ এক নয়।

এই তোষণের সুযোগ নিচ্ছে কিছু মানুষ। তারা হয়তো মনে করছে এই সরকার সংখ্যালঘু ভোট হারানোর ভয়ে সংখ্যালঘু অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নেবে না। তাই তারা শাসক দলের ছত্রছায়াতে থেকে বিবিধ অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বর্ধমানের খাগড়াগড়-এর ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শাসক দলের বহু কমিউনিস্ট জঙ্গি চর সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন। যদিও দল তাদের বহিষ্কার করেছে, তবে ঘটনা ঘটার পর। সম্প্রতি কালিয়াচকের ঘটনা আরো ভয়াবহ। বাইরের লোক ছাড়া আড়াই লক্ষ জনসংখ্যার গ্রামে দেড় লক্ষ জনসমাগম হতে পারে? বাইরের লোক থাকলে তারা কোথাকার? এখানে মনে রাখা দরকার এই বাংলায় অশান্তি হলে পাশের দেশেও তার প্রভাব পড়বে কারণ সেখানে হাসিনা সরকারকে ফেলার অনেক চেষ্টা চলছে।

রাজ্যের এই অবস্থায় আগামী ২০১৬ নির্বাচন বাংলার মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকেই রাজ্যের আগামী দিনের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে কোথাও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হলে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় নয়, পুরো সমাজ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই বাংলার স্বার্থে পরিবর্তনের পরিবর্তন হতেই পারে। কিন্তু যে কারণের জন্য পূর্বের পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রত্যাবর্তন আরো ভয়াবহ।

—পদ্মপ্রিয় পাল,
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

কোচবিহারে মডেল মাদ্রাসা

কোচবিহার জেলায় সরকার পোষিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যা ১০৬টি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি মাদ্রাসাই ছাত্রাধিক্যে জর্জরিত এমন নয়। কিছু কিছু মাদ্রাসা অপ্রতুল ছাত্র নিয়েও বেঁচে আছে। তবে হঠাৎ করে আশু মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজন পড়ল কেন? সংবাদে প্রকাশ ২৭ জানুয়ারি, ৩৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে পঠন-পাঠন চালু হলো ইংরেজি মাধ্যম মডেল মাদ্রাসাটিতে। প্রশ্ন হলো— কেন এই মডেল মাদ্রাসা? উত্তর একটাই— ভোট বড় বালাই।

ভারতীয় সংবিধানে আছে ধর্মের ভিত্তিতেই হোক কী ভাষার ভিত্তিতেই হোক— সকল সংখ্যালঘুরই পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার আছে (অনুচ্ছেদ ৩০ (১)। অনুচ্ছেদ ২৯ (১)-য়ে যেমন সংখ্যালঘুদের ভাষায় অধিকার আছে, অনুচ্ছেদ ৩০ (১)-য়ে তেমনি তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাবার অধিকার দেওয়া আছে। সংবিধানের বিধান যদি এই হয় তবে ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হলো কিনা সেটা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ প্রথমত, কোচবিহারে ৯৯ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলা ভাষাভাষি। যে ভাষারক্ষার মৌলিক অধিকার সংখ্যালঘুদের দেওয়া আছে এক্ষেত্রে সেই দোহাই দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, ধর্মের ভিত্তি যদি এই মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়— তাহলে একই প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, কারণ সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ভাষা আরবি ও উর্দু, যেমন সংখ্যা-গুরুদের ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত। এক্ষেত্রেও ইংরাজি মাধ্যম মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তৃতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেবল তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকারই নয়, তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার অধিকারও আছে।

কোচবিহারে যে মডেল মাদ্রাসাটি চালু হলো সেটিতে প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। বাংলা ভাষাভাষি অবোধ শিশুদের উপর সরকারি আনুকুল্যে ইংরেজি ভাষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার হেতুও এক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়।

আসলে সবটাই সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সংখ্যালঘুদের মনজয়ের প্রচেষ্টা। এই চেষ্টার শুরু হয়েছিল বাম আমলে। ২০১০ সালের ১১ ডিসেম্বর এই মাদ্রাসাটির শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আব্দুস সাত্তার মহাশয়। এবং তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন মাদ্রাসাটির জন্য। বাম সরকার হেরে যাওয়ার পর আরও দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করে বর্তমান রাজ্য সরকার। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে বাম সরকারের অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প বর্তমান রাজ্য সরকার। আদতে সবটাই ভোটের রাজনীতি। এই রাজনীতির ডামাডোলে বিপদে পড়বে নিষ্পাপ শিশু শিক্ষার্থীরা। প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়ার সুযোগ পাবে ছাত্ররা। তারপর যাবে কোথায়? চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলা মাধ্যমে ভর্তি হলে মহা-সমস্যায় পড়বে। আর বে-সরকারি ইংরেজি মাধ্যম উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করা ব্যয় সাপেক্ষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত অভিভাবকের সাধ্যের অতীত।

এই ভোটের রাজনীতি কবে শেষ হবে কেউ জানে না।

—অশোক কুমার ঠাকুর,
কামেশ্বরী রোড (পূর্ব), কোচবিহার।

কতটা নৈতিক এই উগ্র ছাত্র আন্দোলন

বিরাজ নারায়ণ রায়

ঘটনাগুলিকে পর পর সাজালে খুব সহজেই বোঝা যায় ঠিক কোন পথে এগোচ্ছে দেশের ছাত্র আন্দোলনের অভিমুখ। বিশেষ করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনের নামে বেলেল্লাপনা দেখে প্রশ্ন ওঠে এই উগ্র আন্দোলনের নৈতিকতা নিয়েও। আন্দোলনের নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে তাতে ছাত্রদের মৌলিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সত্তরের দশক থেকে এখনও পর্যন্ত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি সৃষ্টির ট্র্যাডিশন সমানভাবে চলছে। আর এতে মদত জুগিয়ে এসেছে বিশেষ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। সাম্প্রতিককালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোক কলরব, হোক চুম্বন, ক্যাম্পাসে অন্তর্বাস ছড়িয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন আবারও সেই নজির স্থাপন করেছে। এর মাত্রা যে কোন পর্যায়ে চলে গেছে তা প্রেসিডেন্সির উপাচার্যকে ঘরে আটকে দেয়ালে অশ্লীল স্লোগান লেখা, অন্তর্বাস পরে অবস্থান মঞ্চে হাজির হওয়ার মতো ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একই চিত্র উঠে এসেছে গজেন্দ্র চৌহানের অপসারণের দাবিতে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের বিক্ষোভ আন্দোলনেও। এই সমস্ত আন্দোলনের ধরন প্রায় একইরকম। ঘেরাও অবস্থান, ক্লাস বয়কট ও সেইসঙ্গে ক্যাম্পাসের ভিতরের সমস্যাকে বাইরে নিয়ে আসার একরকম প্রচেষ্টা। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠন ও অন্যান্য কাজ। প্রশ্ন এখানেই, যে আন্দোলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই স্তব্ধ করে দেয় সেই আন্দোলনের কী যৌক্তিকতা? এখানে আরও একটি বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা হলো ছাত্রদের এহেন অভব্য আচরণের নিন্দা না করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী দু-হাত তুলে সমর্থন করে যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে তাহলে কি এর পেছনে কাজ করছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য, অন্য কোনো মস্তিষ্ক?

সম্প্রতি এই প্রশ্নকে আরো প্রকট করে তুলেছে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা (?) ও তার পরবর্তী ঘটনাক্রম। রোহিতের মৃত্যু আসলে হত্যা না আত্মহত্যা সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। ধোঁয়াশা রয়েছে তার দলিত পরিচয় নিয়েও। কিন্তু এই নিয়ে রাজনীতি করতে ছাড়ছে না কোনো রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন। তাদের মতে সরকারের দলিত বিরোধী মনোভাবই রোহিতের মৃত্যুর কারণ। দফায় দফায় তাদের বিভিন্ন বিক্ষোভ কর্মসূচি বিষয়টিকে সর্বভারতীয় রূপ দিয়েছে এবং ক্রমশ তা সরকার বিরোধিতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্র আন্দোলন সাধারণত ছাত্র স্বার্থেই হয়ে থাকে, সেটাই কাম্য। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এই চিত্রকে ক্রমশ বদলে দিয়েছে। প্রভেদ থাকছে না প্রতিষ্ঠানের ভিতরের ও বাইরের সমস্যার মধ্যে। প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের বাইরে কলরব করতেই যেন তাদের বেশি উৎসাহ। সেই সঙ্গে এমন বিষয় নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে যার সঙ্গে শিক্ষার কোনো যোগ নেই। কিছুদিন আগে সরকার ভারতীয়দের খুল্লাম-খুল্লা পোশাকে গোয়া বীচে ঘোরাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সেই প্রেক্ষিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী প্রকাশ্য চুম্বন করে তার প্রতিবাদে জানিয়েছে। সাধারণ মানুষ এর নিন্দা করলেও এক বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যখনই রাস্তায় নেমেছে তাদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন এই বুদ্ধিজীবীরা।

এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, আন্দোলনের এই উগ্রতার পিছনে শুধুমাত্র ছাত্রদের ক্ষোভ ও দাবিদাওয়া রয়েছে তা নয়, এর পিছনে কাজ করছে বিশেষ কারো প্ররোচনা। যা নিছক কিছু সমস্যাকে গণ্ডির বাইরে টেনে এনে এক বৃহত্তর বিশৃঙ্খলার রূপ দিচ্ছে। পাশাপাশি আর একটি বিষয় ভাববার মতো, সেটা হলো যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সামনে থেকে এই উগ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা কিন্তু সংখ্যায় নেহাতই নগণ্য। বৃহত্তর ছাত্র সম্প্রদায় এদের সঙ্গে নেই। অথচ আন্দোলনের মুখে পড়াশুনার ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে সেই বৃহৎ অংশকেই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলি যদি সরেজমিনে দেখা যায় তাহলে দু-ধরনের ছাত্রছাত্রী চোখে পড়বে। এক, যারা নিয়মিত ক্লাসে যায় এবং নিজেদেরকে পড়াশুনার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চায় (যার সংখ্যাই বেশি)। দুই, যারা ক্যাম্পাসে গিয়ে নিয়মিত ভাবে রোজ কোনো না কোনো বিষয়ে পোস্টার লেখে এবং নিজেদের অতি সচেতন বলে জাহির করে। অত্যন্ত সুচতুর ভাবে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদেরকেই নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজে লাগাচ্ছে দেশের ক্রমশ ব্যাকফুটে চলে যাওয়া এই বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা। যারা গত লোকসভা নির্বাচনের আগে ক্রমাগত বিষোদগার করে নরেন্দ্র মোদীকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করেছিল। তাতে সফল না হওয়ায় এখন মরিয়া হয়ে পড়েছে কীভাবে ছাত্র যুবসমাজের মধ্যে সরকার বিরোধী এমনকী দেশবিরোধী মানসিকতা তৈরি করে দেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করা যায়। সম্প্রতি জে এন ইউ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বামপন্থীদের এখন কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই, কংগ্রেসেরও একই অবস্থা। তাই সফট টার্গেট হিসেবে তারা এখন বেছে নিয়েছে দেশের বৃহত্তম ছাত্রসমাজকে। এক কথায় বাম ও কংগ্রেসপন্থী বুদ্ধিজীবীদের এ এক কুটিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি। যার শিকার দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এই ছাত্ররা যদি আগামী নির্বাচনে সরকার বিরোধী প্রচারে রাস্তায় নামে তাতেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করলে যে পরিষ্কার চিত্রটি উঠে আসে তা হলো, সাম্প্রতিকালে দেশের নামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের মধ্যে যে উগ্র আন্দোলনমুখিতা দেখা যাচ্ছে তা ছাত্র স্বার্থে নয়। এর পিছনে কাজ করছে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ। নৈতিক ভাবে যা 'ছাত্র আন্দোলন' ভাবনার পরিপন্থী। ■

গীতার অষ্টম অধ্যায় : এ যুগের বার্তা

জগদীশ দত্ত

ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞান যোগে উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সূর্যলোক-সহ বিভিন্ন লোকের রাজাদের তাঁর মুখ নিঃসৃত পারমার্থিক জ্ঞান দান করেন। রাজাদের কাজ প্রজাপালন ও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথ প্রদর্শন করা। ভগবানের সঙ্গে মানব জীবনের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে তা জানা ও বিতরণ করা। রাষ্ট্রের শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভক্তির মাধ্যমে এই জ্ঞান বিতরণ করা। সমাজের নেতাদেরও একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত সুধারস সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে প্রত্যেকেই তাদের দুর্লভ মানব জীবন সার্থক করতে পারে। সূর্যলোকে সূর্যদেবের নাম 'বিবস্বান'। তিনি হচ্ছেন সূর্যলোকের অধীশ্বর। সূর্য থেকেই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সূর্যদেব তাঁর কক্ষ পথে চলেন। সূর্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন এবং ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান দান করেন। গীতা স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে এই ভগবদ্ তত্ত্বজ্ঞান বিবস্বান মনুকে দান করেন। মানব সমাজের পিতা মনু এ জ্ঞান তাঁর পুত্র রঘুবংশের জনক ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এই রঘুবংশেই শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভগবদ্‌গীতা মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সময় থেকেই মানব সমাজে বর্তমান। এখন কলিযুগের ৫১১৭ বৎসর চলছে। শুরু হয় ৩১০২ খৃষ্টপূর্বে। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে কলিযুগের স্থায়িত্ব ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ভগবদ্‌গীতার জ্ঞানদান করেন।

৫ হাজার বছর আগে এ জ্ঞান পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দান করেন। গীতা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত বাণী। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগের কথা উল্লেখ আছে। চার যুগের মেয়াদ ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এই চারটা যুগ ক্রমান্বয়ে ঘুরতে থাকে। এক হাজার বার ঘুরলে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং একে কল্প বলা হয়। ব্রহ্মার এইভাবে একশত বৎসর পরমায়ু। লোমশ মুনির মতো অনন্ত কালের তুলনায় তা সামান্য।

সত্যযুগে ছিল সদাচার, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মের প্রভাব। যুগাবতার ছিলেন সত্যনারায়ণ। ত্রেতাযুগে যুগাবতার ছিলেন 'রামচন্দ্র'। এই যুগে পাপের সূচনা হয়। দ্বাপরে যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপরে ধর্মহ্রাস পায়, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। কলিযুগ পাপাচারে পরিপূর্ণ, অধর্মের যুগ। কলির বর্তমান বয়স ৫ হাজার ১১৭ বৎসর। বাকি রয়েছে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৮৩ বৎসর।

কলির বিশৃঙ্খল রূপ, অবিচার, ব্যভিচার দূর করতে মাঝে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুচরদের অবতার হিসাবে মর্ত্যলোকে পাঠান। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, অনুকূল ঠাকুর অবতাররূপে পৃথ্বীলোকে এসেছেন। কলির কুপ্রভাব মুক্ত করতে, স্রষ্টার সৃষ্টিকে রক্ষা করতে অবতার আরো আসবেন। ধর্ম, আদর্শবোধ, ভগবৎ প্রেম, সদ্ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ, নাম সংকীর্তন, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, সৎসঙ্গ, মহামন্ত্র জপ তপ, প্রভুর নির্দেশিত পথে চলার মধ্য দিয়ে মানুষের সৎপ্রবৃত্তিগুলি জাগিয়ে তোলার কাজ চলবে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, সন্তয়নি সদাচার, জীবপ্রেম, ইষ্টপ্রেম— "ঘরে থাক বনে থাকো সদাহরি বলে ডাকো"। পূর্ণ গুরু ঠক্কর মেরে মেরে সব ঠিক করেন বলেই তো তিনি ঠাকুর। সদাচার অভ্যাসযোগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঠাকুরের চরণতলে মানুষকে জড় করতে পারলে অনাচার, ব্যভিচার, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা সমস্তরকম অন্যায় কিছুটা রদ করা যাবে। দিনে দুপুরে পশুসম যে হিংস্র আচরণ চলছে তা কিছুটা রদ করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীতে যত সম্প্রদায় আছে তা সবই ধর্ম নয়। ধর্ম হচ্ছে সনাতনধর্ম বা মানব ধর্ম। মানুষ মানুষ হয়ে উঠবে মানব ধর্ম পালন করলে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন তিনি জেগে উঠবেন। ধর্মকে যে যা নামেই ডাকুক ভগবান এক এবং অভিন্ন। জল (H_2O)-কে যে নামেই ডাকুক জলের ধর্ম এক, জল জলই। আলো, বায়ু সকলের, চাঁদ পৃথিবী সকলের, এদের পৃথক করা যায় না। ভগবানকেও পৃথক ভাবা যায় না। সকলেই পরম পিতার সন্তান। ভগবান (GOD) যিনি জেনারেট, অপারেট ও ডেস্ট্রয় করতে পারেন তিনি ত্রিগুণ-রহিত স্বামী, ভগবান। কলির শেষ ভাগে চরমতম অবস্থায় পশু যেমন উলঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, প্রকাশ্যে কাম চরিতার্থ করে, সম্পর্ক জ্ঞান না রেখে মানুষ সেই ভাবে ব্যভিচারী হয়ে উঠবে। মা-বোনদের উপর যখন ব্যভিচার নেমে আসবে তখন স্বয়ং ভগবান কল্কি অবতার রূপে পৃথ্বীলোকে জন্মগ্রহণ করবেন। সমস্ত অসুর প্রবৃত্তির পশু ও পাপীদের নিধন করবেন। তাঁর লীলা চলতে চলতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। সমস্ত পাপ মুক্ত হবে। পাপী আর পৃথিবীতে থাকবে না। প্রতিষ্ঠা পাবে সত্যযুগ। কলির অবসান হবে। সদ্ গুরুর দীক্ষা নিয়ে যদি মানুষের সুপ্রবৃত্তিগুলো জাগানো যায় কিছুটা হলেও বর্তমান কলির প্রভাব থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। এর দায়িত্ব রাষ্ট্র ও দেশ নেতাদের। ভাবতে হবে তাঁদেরও। পারমার্থিক জ্ঞান যদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারা যায়, ধর্মপ্রাণ মানুষ তৈরি হবে, মঙ্গল হবে বিশ্বের।

মহাভারতের কথা

এক অলৌকিক মিলন

অনিন্দ্যসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন পাণ্ডবদের কাছে যথেষ্ট সম্মান এবং ভালোবাসা পেয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী। এখন তাদের মনে হলো যে বাণপ্রস্থে যাবার সময় উপস্থিত, বাকি জীবনটা বনের মধ্যে কঠোর তপস্যায় কাটাতে হবে। তাঁরা তা জানিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পাণ্ডবমাতা কুন্তীর মনেও বৈরাগ্যের ভাব উপস্থিত হলো, তিনিও ভাশুর এবং জায়ের সঙ্গে যেতে চাইলেন। এই ইচ্ছের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি বারংবার তাঁদের যেতে নিষেধ করলেন, কারো কোনো ত্রুটি হলে সেজন্য ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু তাঁরা বললেন, 'পরপারের ডাক এসেছে, এবার তৈরি হতে হবে, আর আমাদের স্নেহের জালে বেঁধে রেখো না'। এই কথায় যুধিষ্ঠির সম্মতি জানাতে বাধ্য হলেন। তাঁরা তিনজন এক শুভদিন দেখে হস্তিনাপুর ছেড়ে বনগমন করলেন। চিরবিশ্বস্ত সঞ্জয় ও বিদুর তাঁদের অনুগমন করলেন।

শতযূপ ঋষির আশ্রমে তাঁরা অবস্থান করলেন। সাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন, বেশিরভাগ দিন ফল খেয়ে জীবনযাপন করেন। মুনিদের সঙ্গে জীবনের অনিত্যতা নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু কারো মনে শান্তি নেই। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর মনে শতপুত্রের জন্য এবং কুন্তীর মনের গভীরে কর্ণের জন্য তীব্র হাহাকার রয়েই গেছে। এদিকে পাণ্ডবরাও কর্ণ, অভিমন্যু এবং পাঁচপুত্রের শোকে কাতর। এছাড়া বনে মা কুন্তী, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং মাতা গান্ধারী কেমন আছেন এই প্রশ্ন অহরহ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ধর্মরাজের রাজত্ব সুখেশান্তিতে পরিপূর্ণ, প্রজারা যুধিষ্ঠিরের জয়গানে মুখরিত থাকেন, তবুও তাঁদের মনে একবিন্দুও শান্তি নেই। দূর থেকে এই সবই অনুভব করেন মহর্ষি ব্যাসদেব। খুব ব্যথা পান। তিনি তো আর শোকে দুঃখে উদাসীন নির্বিকল্প ঋষি নন। তিনি মহাকবি। এই ব্যথার ঢেউ তার অন্তর ছুঁয়ে যায়। মানুষ জানে যে এই জীবন অনিত্য, সব দুদিনের মায়া। তবু প্রিয়জনদের স্মৃতি শেষদিন পর্যন্ত তাড়া করে বেড়ায়। এক হিসাবে এরা তারই বংশধর, তাঁদের কষ্টে বিচলিত হয়ে পড়ে মহর্ষির মন।

তপস্যার দ্বারা অর্জিত শক্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করা তাঁর কাছে নগণ্য ব্যাপার। কিন্তু কী করা উচিত এই নিয়ে তিনি ভাবিত হলেন। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি দ্বারকার সেই আশ্চর্য মানুষটির কাছে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষিকে দেখে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন, তারপর খুব নম্রভাবে তাঁর এখানে আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। ব্যাসদেব সবার মর্মপীড়ার কথা জানিয়ে কী করা বিধেয় সেটা জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন— 'আপনি ত্রিকালদর্শী ঋষি, আপনাকে আমি কী পরামর্শ দেব?' মহর্ষি বললেন, 'বিনয় কোরো না কৃষ্ণ, লোকে তোমাকে ভগবান বলে মানে, অনেককে তুমি তোমার বিশ্বরূপ দেখিয়েছ'। মৃদু হেসে কৃষ্ণ বললেন— 'নিজেদের থেকে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী লোককেই সাধারণ লোক ভগবান আখ্যা দিয়ে দেয়। কিন্তু আপনি তো ভালভাবেই অবগত যে আমি ভগবান তো দূরস্থান তাঁর ছায়াও নই। জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা থেকে চলে যেতে বাধ্য

হয়েছিলাম, শত চেষ্টাতেও কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় ঠেকাতে পারিনি, মহান কুরুবংশ আজ টিমটিম করে মহারাজা পরীক্ষিতের মাধ্যমে জ্বলছে'। ব্যাসদেব বললেন— 'অসহায় মানুষ যাকে ভগবান মনে করে তার মধ্যে কিছু তো দৈবশক্তি আছে কৃষ্ণ, থাক এসব কথা। এখন কীভাবে ওদের মধ্যে এই শোকের তুষানল প্রশমিত করা যায় সেই ব্যাপারে কিছু বলো'। একটু চিন্তা করে কৃষ্ণ বললেন— 'এ তো আপনার কাছে নগণ্য ব্যাপার মহামুনি। সম্প্রতি আপনি মৃতদের সশরীরে মর্ত্যে আনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। যুদ্ধে মৃত প্রিয়জনদের সঙ্গে কুরুবংশের লোকেদের একবার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিন, তাহলেই তাঁদের শোক অনেকাংশে দূরীভূত হবে, জীবনের নশ্বরতা তাঁরা সত্যি করে অনুভব করবেন'। চমকিত ব্যাসদেব বললেন 'তুমি সত্যি সর্বজ্ঞ, বাসুদেব'! 'আদৌ তা নয় হে মহাকবি, সারাদেশেই আমার অসংখ্য চর ছড়িয়ে আছে, এমনকী আপনার আশ্রমও তার থেকে মুক্ত নয়। কে কী করছে প্রতিনিয়ত তার খবর আমার কাছে চলে আসে, এটাকে আপনি অলৌকিক কিছু দয়া করে ভাববেন না' —শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন। ব্যাসদেব বললেন— 'তাও বলবো, প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তুমি অসামান্য। তথ্যসংগ্রহ এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগ করে তুমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাবড় মহারথীদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলে। এখন তাহলে আসি, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবদের ব্যাপারটা জানিয়ে দিই। এতবড় কাজের জন্য আমারও কিছু প্রস্তুতি লাগবে, তাঁরাও সব মানসিকভাবে তৈরি হোক'। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের চরণ ছুঁলেন, আশীর্বাদ করে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

(দুই)

ব্যাসদেবের কথায় যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্র যুগপৎ আকুল এবং বিস্মিত হলেন, এমনও কী হওয়া সম্ভব? হেসে ব্যাসদেব বললেন, 'তাঁরা যেন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন এমনভাবে মৃতলোক থেকে আসবেন, যুদ্ধের কথা তাঁদের তেমন স্মরণে থাকবে না। তাঁদের অবস্থানের ব্যাপারে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। আজ থেকে কুড়ি দিন পরে শুক্লা পঞ্চমীর দিন সবাই আমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসবে, সেখানেই সবার এই কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ ঘটবে'।

নির্দিষ্ট দিনের অপরাহ্ণে সবাই ব্যাসদেবের সঙ্গে জাহ্নবী তীরে বনের মাঝে এক অতি নির্জন সঙ্গে উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, পাণ্ডবরা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, পাণ্ডবদের অন্যান্য স্ত্রীগণ, কৌরবদের শতপুত্রের স্ত্রীরা সবাই ব্যাসদেবের পরবর্তী আদেশের প্রতীক্ষায় রইলেন। সন্ধ্যাকালে ব্যাসদেবে জলে নেমে মৃতবীরদের আহ্বান করলেন। যুদ্ধের সময়ের মতো ভয়ানক নাদে সমরের সাজে একে একে দুর্যোধনরা শত ভাই, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শকুনি, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাই জলের মধ্যে থেকে তীরে উঠে এলেন। তাদের চেহারা আগের থেকে বহুগুণে তেজোদৃপ্ত, দেবতাদের মতো উজ্জ্বলকান্তি। ব্যাসদেব প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী পুত্রদের দেখতে পেলেন। দুর্যোধনরা শতভাই পিতামাতা এবং কুন্তীকে প্রণাম করলেন আর পাণ্ডবভাইদের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। মহাবীর কর্ণকে দেখে পাণ্ডবদের আবেগ বাঁধ মানল না, সবাই তাঁকে প্রণাম করে কাঁধে তুলে নিলেন। অর্জুনের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত হবার কথা তাঁর মনে ছিল না। কর্ণের মস্তক আঘ্রাণ করে আর কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে কুন্তীর মন শীতল হলো, পাঁচভাইয়ের সঙ্গে কর্ণকে এমন ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চেয়েছিলেন, আজ তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হলো। ভীষ্ম এবং দ্রোণকে সবাই আভূমিনত হয়ে প্রণাম জানালেন। তাঁরাও প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। শকুনিকে যুধিষ্ঠির মাতুল সম্বোধনে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন সজলচোখে শকুনি তাকে ভাগিনেয় বলে জড়িয়ে ধরলেন। বাবা ও ভাইকে দেখে দ্রৌপদী আনন্দে কেঁদে ফেললেন। অভিমন্যুকে সামনে পেয়ে সুভদ্রার চোখে জল এল। অভিমন্যু মাতাকে প্রণাম করলেন, পাশে দাঁড়ানো উত্তরা ছুটে এসে অভিমন্যুকে আলিঙ্গন করলেন। এ দৃশ্যে দ্রৌপদী ও সুভদ্রার চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, সুদূর বিরহের পর প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের স্বাদ তারা আগে পেয়েছেন। কৌরবদের একশো পত্নী তাদের পতিদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে সুখে বিহার করলেন।

ভোর হলো। মৃতেরা সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই ফিরে গেলেন। সবাই অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। প্রিয়জনদের সাময়িক ফিরে পাবার আনন্দে তারা বিহ্বল ছিলেন। ব্যাসদেব এতক্ষণ অদৃশ্য ছিলেন। এবার সবার গোচরে এসে মধুরকণ্ঠে বললেন— 'যাদের মৃত প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হবার তর সইছে না তাদের জন্য তপোবলে একটা উপায় আমি ভেবেছি। তারা এখনই গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন করলেই তাদের সূক্ষ্মশরীর প্রিয়জনের সঙ্গে অবিলম্বে মিলিত হবে'। একথা বলামাত্র কৌরবদের একশো বিধবা পত্নী গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর উঠলেন না। তাদের আত্মা বাঞ্ছিতধামে চলে গেল। এমন দৃশ্যে সবাই বাক্যহারা হয়ে গেলেন।

ব্যাসদেব বললেন— 'বৎস্য ধৃতরাষ্ট্র, তোমার শোক দূরীভূত হয়েছে তো? তিনি বললেন— 'হ্যাঁ প্রভু, আমার পুত্রশোক আর নেই। জীবন যে বাস্তবিক মায়াময় তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি, আজ আমি মায়ামুক্ত হলাম। কঠোর তপস্যার দ্বারা বাকি জীবন আমি কাটিয়ে দেব'। ব্যাসদেবের আদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির ছাড়া সবাই সেখান থেকে চলে গেলেন। নীচুকণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেন— 'আপনি মৃতদের পরলোক থেকে আনার মতো অতীব দুরূহ কর্ম কীভাবে সম্পাদন করলেন, আপত্তি না থাকলে যদি বলেন'। ব্যাসদেব বললেন— 'ধর্মরাজ, তোমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই স্বপ্নই দেখে আসছ যে যদি মৃত প্রিয়জনদের সঙ্গে আবার দেখা হয় তবে প্রাণটা খানিক জুড়োয়। নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করেও অপ্রাপ্তি, অনুতাপ তোমাদের তাড়না করে বেড়াতো। তাই সুখ পেলেও তোমরা কেউই শান্তি পাওনি। আমার তপস্যাবলে তোমাদের এই স্বপ্নের একটা বাস্তবরূপ দিলাম, তোমরাও মৃত প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তিলাভ করলে। বৎস্য, সবই কালের অধীন। যা হয় সব ভগবানের ইচ্ছেতে। তুমি এখন বিগতশোক হয়ে রাজত্ব কর, প্রজাপালন কর এটাই প্রভুর ইচ্ছা। এখন আসি, অনেক তপস্যা বাকি রয়ে গেছে। ব্যাসদেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এই পরমজ্ঞানী এবং মহাত্যাগী মানুষটির গমনপথের দিকে চেয়ে যুধিষ্ঠির ভাবলেন— 'লোকে ভাবে আমি সর্বজ্ঞ, কিন্তু আদপে আমি কিছুই জানি না। জীবন মায়াময় জেনেও শোক, দুঃখ, আনন্দ সব অনুভূতিতেই আমি সাড়া দিই। অনেক কিছু পেয়েও জীবনের রহস্য অজানা থেকে গেল, কিছুই এখনও বুঝলাম না।

(মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্ব অবলম্বনে)

নচিকেতা

অনেকদিন আগে বাজশ্রবস নামে এক ঋষিপুত্র ছিলেন। তিনি একবার 'বিশ্বজিৎ' নামে একটি যজ্ঞ করবেন বলে ঠিক করলেন। এই যজ্ঞের নিয়ম হলো যজ্ঞের শেষে নিজের সবকিছু দান করতে হয়। বাজশ্রবস ছিলেন একটু কিপটে ধরনের ঋষি। যজ্ঞের শেষে দান হিসেবে যত রোগা রোগা বুড়ো গোরু ব্রাহ্মণদের দিতে লাগলেন।

বাজশ্রবসের ছোটছেলের নাম নচিকেতা। সে সত্যকে খুব ভালোবাসে। যজ্ঞের পর বাবার সমস্ত কাণ্ডটা সে আগাগোড়া দেখছিল। দক্ষিণাদানের সময় ওই বুড়ো গোরুগুলো দিতে দেখে তার খুব খারাপ লাগলো। গোরুগুলোকে তো দেখে মনে হচ্ছে এরা মোটেই কাজে লাগবে না। এগুলোকে দান করলে বাবার খুব পাপ হবে। নচিকেতা ভাবতে লাগলো কী করে বাবার এই পাপ কমানো যায়। শেষে একটা উপায় সে খুঁজে পেল। বাবার কাছে গিয়ে সে শান্তভাবে বলল— বাবা আমাকে কার কাছে দান করলে? বাজশ্রবস ছেলের কথায় কান দিলেন না। নচিকেতা তখন বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। এইবার মহা চটে উঠলেন বাবা, বললেন— যা, তোকে যমের কাছে দান করলাম।

যম অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা। যমের কাছে দান করা মানে মরে যেতে বলা। নচিকেতা সত্যকে মেনে চলে, তাই তখন সে মৃত্যুর জন্য বসল। অদ্ভুত ভাবে মৃত্যু হলো নচিকেতার। মৃত্যুর পর সত্যপ্রিয় ছোট্ট ছেলেটি পৌঁছে গেল যমের বাড়ির দরজায়। যম তখন বাড়ি ছিলেন না। কোনো কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছেন। নচিকেতা তার অপেক্ষায় তিনদিন তিনরাত বসে রইলো যমের দুয়ারে। তিনদিন পর যম এসে শুনলেন এই ব্রাহ্মণ বালক তিনদিন থেকে উপোস করে বসে আছে।

সর্বনাশ, অতিথি উপোস করে আছে! এ তো মহাপাপ হবে।

যমরাজ তাড়াতাড়ি ছুটলেন নচিকেতার কাছে। তার কষ্টের জন্য হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন, বললেন— নচিকেতা তিনটি রাত তুমি উপোস করে কাটিয়েছো। তাই আমি তোমাকে তিনটি বর দিতে চাই, বল তুমি কী বর চাও?

নচিকেতা যমের আনা জল খেয়ে একটু ধাতস্ত হলো। তারপর বলল— হে যমরাজ, আমি আমার বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। ফিরে যাবার পর বাবা যেন আমাকে চিনতে পারে। মৃত্যুলোক থেকে ফিরেছি বলে আমাকে যেন ত্যাগ না করে। এই আমার প্রথম চাওয়া। দ্বিতীয়, আপনি আমাকে স্বর্গে যাওয়ার অগ্নিবিদ্যা শিখিয়ে দিন এবং তৃতীয় হলো মানুষের মৃত্যুর পর আত্মাকে জানার আত্মবিদ্যা আমাকে বলুন।

যমরাজ বললেন— ঠিক আছে, তাই হবে।

বিরাজ নারায়ণ রায়

মণীষী কথা

গুরুসদয় দত্ত

গুরুসদয় দত্ত বাংলার মানুষের কাছে পরিচিত মূলত ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। ১৮৮২ সালের ১০ মে অবিভক্ত বাংলার সিলেট জেলার বিরশ্রী গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ৯ বছর বয়সে বাবা ও ১৪ বছর বয়সে মা-কে হারিয়ে জ্যাঠামশাই-য়ের কাছে মানুষ হন। এন্ট্রান্স এবং এফ এ পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও জ্যাঠামশাই তাঁর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিতে চাননি। অবশেষে সিলেট ইউনিয়নের স্কলারশিপের সাহায্যে বিলেতে পাড়ি দেন এবং আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ছোটোবেলা থেকেই গুরুসদয় ছিলেন মানবদরদী। বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অল্প বয়স থেকেই তিনি মানুষের পাশে ছুটে গেছেন। এদেশের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্য ব্রতচারী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। এর পাশাপাশি বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন নৃত্যশৈলী ও কলা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই জনদরদি, মহাপ্রাণ ১৯৪১ সালে ২৫ জুন মাত্র ৫৯ বছরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্নবাণ

১.হিন্দু স্কুল কত বছরে পদার্পণ করল?

২.বি বি সি-র মুখ্য কার্যালয় কোথায়?

৩.ইউনেস্কো-র ১৯তম সাধারণ সভা কোথায় হয়েছিল?

৪.কলকাতায় কত সালে মেট্রো রেল চালু হয়?

৫.টাইটানিক জাহাজ কোন বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল?

উত্তর : ১. দুশো। ২. লন্ডন। ৩. কেনিয়া। ৪. ১৯৮৪। ৫. ইংল্যান্ডের সাউথম্পটন।

ছবিতে অমিল খোঁজ

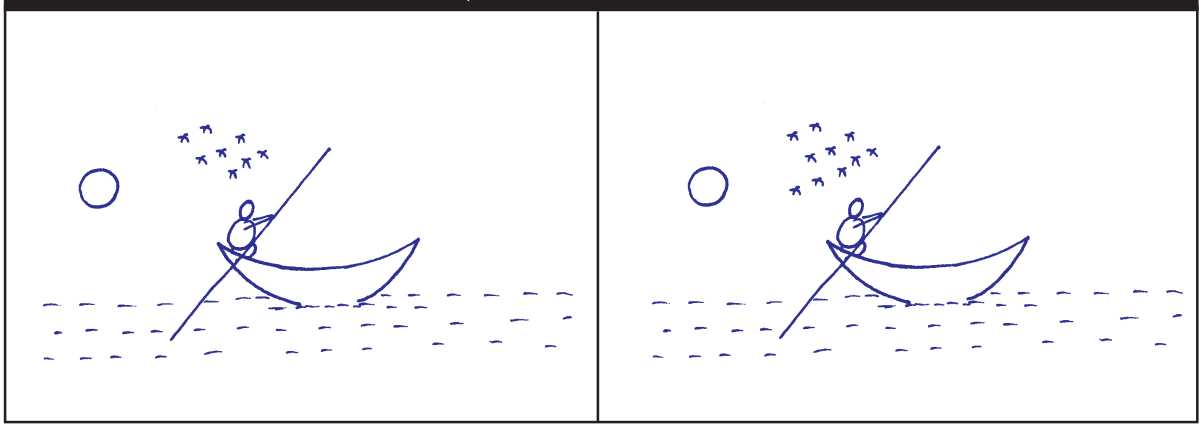

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) শা ন ন্ধ লা

(২) কু তা র ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) মা দ ব লা ল

(২) তি খ্য লে গী আ

১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) দ্বিরাগমন (২) উপঢৌকন

১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) সংবাদপত্র (২) রচনাশৈলী

উত্তরদাতার নাম

(১) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬ (২) সংযুক্তা ব্যানার্জী, হায়দারপুর, মালদা (৩) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা (৪) পূজা বরাট, ছাতনা, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

ব্যতিক্রমী নিধি

শবরী ঘোষ

সিয়াচেনের সালতোরো রেঞ্জে টানা ছ'দিন ৩৫ ফুট বরফের নীচে চাপা পড়েছিলেন ল্যান্সনায়েক হনুমানথাপ্পা কোপ্পাড়। সেনাবাহিনী তাঁকে উদ্ধার করার তিন দিন পরে সেনা হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ভারতমাতার এই বীর সন্তান। তাঁর অমর আত্মার প্রতি প্রথমেই জানাই শ্রদ্ধা ও সম্মান। সেই সঙ্গে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি ব্যতিক্রমী নামকেও কুর্নিশ না জানিয়ে পারছি না। তিনি হলেন উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরের গৃহবধূ শ্রীমতী নিধি পাণ্ডে। নিধি একটি সংবাদ চ্যানেলে ফোন করে দিল্লীর সেনা হাসপাতালের ফোন নম্বর জানতে চান হনুমানথাপ্পার প্রয়াণের দুই দিন আগে। সংবাদমাধ্যমে ওই জওয়ানের কিডনি কাজ না করা এবং সংকটজনক অবস্থার কথা জেনে দান করতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের কিডনি।

এখন সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে 'অসহিষ্ণু' মেয়েদের কথা। নিধি যেদিন ওই সংবাদ চ্যানেলে ফোন করেছিলেন সেই দিনই দমদম মেট্রো স্টেশনে কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন গ্রুপ থিয়েটারের এক মহিলা কর্মী। ওই মহিলা ৫০০ টাকার নোট দিয়ে পাঁচ টাকার একটি টিকিট কিনতে চেয়েছিলেন। কর্তব্যরত কর্মী তাঁকে জানান যে, তাঁর কাছে অত টাকার খুচরো নেই। পার্শ্ববর্তী কাউন্টারের এক কর্মী তখন জানান যে, তিনি ৫০০ টাকা ভাঙিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ওই মহিলাকে খুচরো পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে। এই সামান্য ঘটনাতেই ওই মহিলা রণংদেহী মূর্তি ধারণ করে কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দেন। শেষে স্টেশন মাস্টার, আর পি এফ ও সিঁথি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সেদিনই আবার ধূপগুড়িতে প্রমীলাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিণী। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাবার সময় হঠাৎ করেই ওই মহিলারা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। স্থানীয় এক যুবকের বিয়ের প্রস্তাব কেন সে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছে এই অভিযোগে বচসা শুরু করে তার সঙ্গে। এরপর মেয়েটিকে চুলের মুঠি ধরে সাইকেল থেকে নামিয়ে এনে বেধড়ক মারা হয়। তার ভাইও প্রহৃত হয়। খবর পেয়ে মেয়েটির মা ঘটনাস্থলে এলে প্রমীলাবাহিনী তাদের তিনজনকেই গাছের সঙ্গে বেঁধে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মারে। ওই মহিলাদের সামনেই এরপর এক যুবক তার বন্ধুদের নিয়ে এসে অশালীন ভাষায় হুমকি দেয় মেয়েটিকে।

সংবাদপত্রের দরকার নেই, প্রতিদিন ট্রেনে, বাসে, বাজারে, স্কুলে, অফিসে, হাসপাতালে আমরা এই ধরনের মহিলাদের দেখতে পাই। মেট্রোর হ্যান্ডেলে এক মহিলার হাতের ওপর আরেক মহিলার হাত রাখাকে কেন্দ্র করে অফিস টাইমে ধুন্ধুমার কাণ্ডের সাক্ষী আমি নিজে। সামান্য অজুহাতে এখন তথাকথিত শিক্ষিতা মহিলারা অপরের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেন। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ভাষায় অবাধে অশ্লীল গালাগালি দিতে থাকেন অপরকে। এমনকী গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা বোধ করেন না। প্রতিপক্ষ পুরুষ হলে তো এঁদের বীরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। কয়েক বছর আগে ভুল করে ট্রেনের মহিলা কামরায় উঠে পড়া এক সাধারণ পুলিশকর্মীকে শিয়ালদহ মেন শাখার একটি স্টেশনে নামিয়ে কান ধরে ওঠবোস করিয়েছিলেন এক দল মহিলা। আর হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে মহিলা জওয়ান কর্তৃক এক যুবককে ঠেলে ফেলে দেওয়া ও তার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাটি তো সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার সর্বাপেক্ষা নক্কারজনক উদাহরণ।

অনেকদিন ধরেই এক শ্রেণীর মেয়ে পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে লড়াই করছেন। কেউ কেউ মনে করেন পুরুষদের মতো পোশাক পরলে অথবা বিড়ি, সিগারেট, মদে অভ্যস্ত হলে কিংবা মধ্য রাতে শহরের রাস্তায় বেলেল্লাপনা করে বেড়ালেই তাঁরা পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে যাবেন। অশ্লীল গালিগালাজ বা মারপিট— কোনো কিছুতেই এদের অরুচি নেই। মহিলাদের আরেকটি শ্রেণী মনে করেন যে, তারা যে অপরাধই করুন না কেন মহিলা হওয়ার সুবাদে ঠিক ছাড় পেয়ে যাবেন। এরা হলেন সুবিধাবাদী। তৃতীয় শ্রেণীর মহিলারা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী বা ঘনিষ্ঠ। শাসকের বৃত্তে থেকে এঁরা যা খুশি করার 'গণতান্ত্রিক' অধিকার ভোগ করেন। আর চতুর্থ শ্রেণীটি হলেন তথাকথিত এলিট। বাবার অর্থ অথবা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ডিগ্রি— এ দু'টো বা এর কোনো একটা থাকলেই তাঁরা অসভ্যতা করার অধিকার পেয়ে যান। কমনীয়তা, মমতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা— নারীর এই মানবিক গুণগুলির মূল্য এদের কাছে কানাকড়িও নয়। এরা ছাড়া আরেক শ্রেণীর মহিলা আছেন। গ্রাম বা ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা দেহাতি মহিলা বা পুরুষ দেখলেই এদের ক্রোধ প্রকাশ পায়। সুযোগ বুঝলেই জাত তুলে গালাগাল দেন এরা।

এইসব অসহিষ্ণু মেয়েদের মাঝে নিধি দেবীর কথা জানতে পেরে গর্ব হয় বই কী! হনুমানথাপ্পার সঙ্গে তাঁর কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, এমনকী পরিচয় পর্যন্ত নয়। তবু একই দেশমাতৃকার সন্তান নিধি ওই অপরিচিত জওয়ানের জন্য কিডনি দান করতে চেয়ে একই সঙ্গে তাঁর দেশপ্রেম ও নারীর স্বভাবোচিত মাতৃত্বের স্বাক্ষর রাখলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, আজও আমাদের দেশের অনেক নারীর মধ্য থেকে কোমলতা, স্বার্থশূন্য ভালবাসা আর বলিদানের ঐতিহ্য মুছে যায়নি। শিরোনামে আসতে গেলে আর্থ-সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড, নামি স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেট অথবা আধুনিক কেতা অনুযায়ী অসভ্যতা করার প্রয়োজন পড়ে না। স্বাভাবিক মানবিক গুণে পরিপূর্ণা হলেও মানবসমাজ তাকে মাথায় করে রাখে। ঠিক যেমন ফুলের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর তার দিকে ছুটে আসে। নিধি-র মানবিক গুণের সৌরভও তেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ুক চারিদিকে। ▮

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডকারখানা কেন দুরভিসন্ধিপূর্ণ তা বোঝা দরকার

অতিথি কলম

কাঞ্চন গুপ্ত

শুরু হয়েছিল হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবার জে এন ইউ। এই ঝোপঝাড়ের আগুন বহ্ন্যুৎসবের মতো ছড়াবার ক্ষমতা রাখে। এর মূল উদ্দেশ্য ভারতের নগরায়ণের ক্ষেত্রে ঘটে চলা নীরব বিপ্লবকে দমন করা। এই বদ উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করতে চাই কড়া রাজনৈতিক জবাব।

ভারতের ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতি মোটেই নতুন নয়, বিশেষ করে আবাসিক শিক্ষায়াতনগুলিতে তো নয়ই। কারণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কড়া নজরে ছেলেমেয়েদের তাদের বই-খাতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হয়। খুব একটা সিনেমা বা অবাধ টিভি চ্যানেল দেখা সবের ওপরই একটা নজরদারি থাকে। এখান থেকে বেরিয়ে হোস্টেল জীবন সব সময়ই একটা মুক্তির আস্বাদন।

জে এন ইউ-এর ঘটনা তরুণ সমাজের কাছে বিপ্লবের মিথ্যে বুলি ফেরি করা মহাজনদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সুযোগ এনে দিয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পোশাক আশাকের স্টাইল কিন্তু সদাই বহতা সময়ের মতো বদলে যায়। এক সময়ের ড্রেনপাইপ প্যান্টকে খুবই অতি আধুনিক ধরা হোত। ঝট করে এসে গেল বেলবটম প্যান্ট, তার সঙ্গে আঁকি বুকি কাটা শার্ট যার কলার আবার সারমেয়দের অনুকরণে তৈরি হোত। একে সরালো জিন্‌স, আবার কোনো ক্ষেত্রে পাজামা পাঞ্জাবি, সঙ্গে কোলাপুরী চপ্পল। এখন শুনছি আবার সেই ড্রেনপাইপ প্যান্টই চামড়া সাঁটা (skin fit) নামে বাজার কাঁপাচ্ছে।

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের এই নিত্য পরিবর্তনশীল ফ্যাশন স্টেটমেন্টের বিপরীতে একটি জিনিস কিন্তু নিশ্চলভাবে স্থির, তা হলো, আবাসিক শিক্ষায়াতনগুলির ছাত্র রাজনীতির চরিত্র। অনাদিকাল থেকেই এর ধারা বাম। তিন দশকেরও বেশি আগে আমি যখন কলেজ ছাত্র ছিলাম তখন উগ্র বামপন্থী হওয়াটা ছিল চূড়ান্ত উদার মানসিকতার প্রতীক। এই ভাবধারা কিন্তু আজও একই জায়গায় স্থানু হয়ে রয়েছে। এই বামপন্থী বিচারধারা আবার নানান খণ্ডিত অবতারে, শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিরাজ করে। যেগুলির সঙ্গে জুড়ে থাকে এদের সমর্থকরা। অথচ এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে চালু রাজনীতি বা দায়বদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এই ছাত্র সংগঠনগুলি সদা শান্তিপ্রিয়। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলি শ্রেণীসংগ্রামের ডাক দিয়ে হিংসার আগুনে বিপুল ইন্ধন যুগিয়েছিল। সেই সময়ে বামপন্থী, তারপর চরম বামপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল বামপন্থী পরিশেষে কংশাল (দিনের আলোয় নকশাল, রাতে কংগ্রেসী) নামে পরিচিত নানা গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে তুমুল হিংসাত্মক কাজকর্মে রাজ্যকে অস্থির করে তুলেছিল। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে খুন করা হয়। অহোরাত্র বোমাবাজি চলত, মনে হোত বিপ্লব সমাগত।

এ সময় বহু অত্যাচারী পুলিশ অফিসার নাগাড়ে নকশালদের জেলে পুরতো। আকচার সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনা ঘটত। অভিযুক্তদের দিয়ে মার্কস, লেনিন, মাও-এর নামে ধিক্কার দিতে বাধ্য করা হোত। শুধু তাই নয়, তাদের যে সব কমরেডরা আত্মগোপন করে রয়েছে তাদের সঙ্গে তারা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করত। গোপন খবরাখবর সবই পুলিশের গোচরে নিয়ে আসত। এইভাবে বিপ্লবীর খোলস ছেড়ে পুলিশের বা সরকারের সহযোগী বনে যাওয়ার বিনিময়ে তাদের অনেককে আমেরিকা চলে যাওয়ার একটি একমুখী টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হোত। কলেজস্ট্রিটে অবস্থিত তৎকালীন ইউ এস ই এফ আই অফিসটি সরাসরি লালবাজারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত। এই পদ্ধতিতে পুলিশ তাদের ফেররি আসামিদের যেমন পাকড়াও করত আর আমেরিকা পেয়ে যেত দেশের বেশ কিছু সেরা মেধা। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন দু'জনকে জানি যারা আমেরিকার প্রদেশগুলিতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছে। ৭০ দশকের সেই অগ্নিগর্ভ দশক সুদূর অতীতে মৃত। কিন্তু বিপ্লব বা তার কষ্টকল্পনাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে তা অনেক আগেই ছড়িয়ে পড়েছে। বামপন্থী সক্রিয়তার মোহে ছাত্রদের আকৃষ্ট হওয়া দোষের নয়। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মহান ও মুক্তিকামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সব রকমের সততা ও নীতিনিষ্ঠতার তারাই যে

ধারক ও বাহক এমন একটা ভাবনা কাজ করে। তাবৎ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় তারাই যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানান কিসিমের বামপন্থী ভাবনার শাখাদলগুলি তাদের নানান রাস্তায় পরিচালিত করে সেই ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে সহযোগিতা করে।

এরপর নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই অনেকে ভালো চাকরিতে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গগনচুম্বী চিন্তা বহতা সময়ের মতো কোথায় ভেসে যায়। অনেকেই কৃতবিদ্য হয়ে বড় সরকারি আমলা হয়ে যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে এক সময় বিপ্লব করতে চেয়েছিল তাকেই কায়মনোবাক্যে সচল রাখে। এদের অতি নগণ্য প্রায় সংখ্যালঘু অংশ শেষাবধি বামপন্থীদের পতাকাবাহক হয় যাদের অধিকাংশই অকালে মারা যায় বা দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। বাস্তবে, মধ্য বয়সে বিপ্লবী বনে থাকাটা সত্যি খুবই করুণ।

তবে এদের চেয়েও আদর্শগতভাবে নিঃস্ব আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা সদাই মূর্খের মতো মনে করেন তাঁরা বামপন্থী ভাবধারাকে সজীব রাখছেন। যদিও ভালোই জানেন তাদের আদর্শ কেউই গ্রহণ করে না আর নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে তাঁরা ভুলে যান বয়স পেরিয়ে যাওয়া ঘোড়াকে যেমন নির্দ্বিধায় মেরে ফেলা হয়, তাঁদেরও বাতিল আদর্শের সঙ্গে সময় পরিত্যাগ করবে। বিষয়টা অনুধাবন করে অনেকেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তার (Left of Centre, CPM, CPI etc.) দিকে বিপ্লব ফেলে ঝুলে পড়েন, কিছু আবার দক্ষিণ পন্থাও ধরেন। সংবাদশীর্ষে আসা জে এন ইউ দেশের অন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মতো যেখানে বিপুল সরকারি টাকার মঞ্জুরি আসে সেখানেই যেমন বামরাজনীতির বিলাসিতা লক্ষ্য করা যায়, তার থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সুবাদে সেখানে যেমন বরাবরই বিপুল অর্থ বরাদ্দ এসেছে, তেমনি চরমপন্থী, বামরাজনীতিরও কোনো ঘাটতি পড়েনি। বুঝে নেওয়া দরকার বুদ্ধিজীবীর ভেকধারী এক শ্রেণীর ধূর্ত অধ্যাপকবাহিনী মুক্ত চিন্তা ও গণতন্ত্র প্রসারের অছিলায় পড়ুয়াদের মেকি বিপ্লবী হওয়ার পথপ্রদর্শক সেজে নিজেদের বিদগ্ধতা (অন্য অর্থে চরম মূর্খতা) জাহির করেন। বর্তমানে জে এন ইউতে বামপন্থা একাধারে শোষণ ও মুক্তির দ্ব্যর্থবোধক শব্দে পরিণত হয়েছে। এখানে যোগ না দিলে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে না এই প্রলোভন দেখিয়েই বামপন্থী বানানো হয়। নাম লেখালেই পড়ুয়ারা মনে করে তারা জাতে উঠে গেল। অন্য চিন্তাধারার অস্তিত্বই এদের উন্নাসিকতার শিকার হয়। কেউই একবাক্যে একথা বলছে না যে ৯০ জন পড়ুয়া সেদিন জড়ো হয়ে দেশের সংসদ আক্রমণকারী প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত আফজল গুরুর শহীদ দিবস পালন করছিল তারাই জে এন ইউ-এর প্রতিনিধি। মোটেই তা নয়। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ওই ছোট গোষ্ঠীটি যখন ভারতবিরোধী উত্তেজনাকর স্লোগান দিচ্ছিল তখন তাদের সেটা প্রতিবাদযোগ্য বলে মনে হয়নি। এই ব্যাপারটাই আশঙ্কাজনক। এই স্লোগান দেওয়া মোটেই বাক্‌স্বাধীনতার এক্তিয়ারভুক্ত নয়, উল্টে যে রাষ্ট্রপ্রণালী এই ছাত্রদের ধারক ও বাহক সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করার আহ্বান। ভারতীয় করদাতার টাকা থেকে বছরে ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা জে এন ইউ ছাত্রদের মাথাপিছু খরচ হয়ে থাকে। তারা দেশের নাগরিক হিসেবে সবরকম সুযোগ-সুবিধে দাবি করে এবং পেয়েও থাকে।

তাই বলা দরকার যতক্ষণ এবং যতদিন পর্যন্ত তারা দেশবাসী তথা রাষ্ট্রের অর্থের ওপর নির্ভরশীল ততদিন সেই রাষ্ট্র ও করদাতার ওপর মুখে লাথি মারা নিছকই নিমকহারামি।

তাদের অধিকার আছে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা বা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যেসব জঙ্গিগোষ্ঠী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার, তবে তা অবশ্যই করদাতাদের টাকায় বেঁচে থাকা বন্ধ করার পর করতে হবে।

অবশ্যই তাদের এই নতুন রাস্তায় নামার যে স্বাধীনতা ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বিপ্লবী আয়েশ ভোগ করা মানা যাবে না। ভাবতে লজ্জা হয়, একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে অকাতরে হিংসা প্রচার করা হচ্ছে! সম্প্রতি এক ভয়ঙ্কর জঙ্গির মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার সঙ্গে সংহতি প্রদর্শন করতে যারা জড়ো হয়েছিল তারা ঠিক এই কাজটাই করছিল।

আপনি যদি একটু মন দিয়ে এদের স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গি, মুখের বিকৃতিগুলি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন এরা পূর্ণ সাবালক ও নিজেদের কৃতকর্মের সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ। এখন প্রশ্ন আসে তাহলে কি এই কু-কর্মের মাথাদের গ্রেপ্তার করে দেশদ্রোহিতার মামলা দেওয়া বেঠিক? আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। আমাদের আদালত তার নিজস্ব মতামত দেবে। অনেকেই জানেন মাওবাদীদের সহযোগী বিনায়ক সেনকে আদালত মুক্তি দিয়েছে। তবুও এই ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম ও তার পরিণতিতে অরাজকতা সৃষ্টি করা—একে বন্ধ করতে কিছু একটা করার প্রয়োজন আছে।

নিশ্চিতভাবে এর মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য ও বৃহত্তর প্ররোচনা রয়েছে। ভারতে উন্নয়নের যে লক্ষণগুলি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে তাকে বেপথু করে অর্থনীতিকে স্থবিরত্বের পথে ঠেলে দেওয়ার বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহার করা যাচ্ছে, যাতে সরকারের উন্নয়নের অভিমুখটি লক্ষ্যচ্যুত হয়।

তাই মনে হয়, এই কু-পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করতে দরকার জোরালো রাজনৈতিক প্রতিরোধ। জে এন ইউ-এর ঘটনা তরুণ সমাজের কাছে বিপ্লবের মিথ্যে বুলি ফেরি করা মহাজনদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সুযোগ এনে দিয়েছে। সরাসরি ছাত্রদের মাঝে একের সঙ্গে এক মিলিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছাড়াও অন্যান্য অংশের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে একটি অনুরোধ প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাখছি। নরেন্দ্র মোদী বাছাই কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে গিয়ে মুখোমুখি সাক্ষাৎ করুন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে অতীতে এমনটা করে দেখিয়েছেন। আর ফলও পেয়েছিলেন হাতেনাতে। তার পুনরাবৃত্তি তিনি কি করতে পারেন না? ■

কামদুনি থেকে সিতাই — ধর্ষক রক্তচোষারা সক্রিয়

জেগে না থাকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে

সাধন কুমার পাল

গণধর্ষণ ও নৃশংস খুনের মতো ঘটনার পর কোনো রকম বিক্ষোভ প্রতিবাদ সংগঠিত হতে দেখলেই শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে স্থানীয় প্রশাসনও। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ধর্ষণের পর ভয়ঙ্কর ভাবে খুন হয়ে যাওয়া মেয়েটির চরিত্র নিয়ে, ওই পরিবারের সামাজিক অবস্থান নিয়ে। সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সহমর্মিতা, সহানুভূতি, ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রতিবাদের আকার নিলেই বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে নির্যাতিতা, ধর্ষিতা, মৃতার পরিবারকে।

নিরাপত্তার আশ্বাস, ভবিষ্যতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো সাহসের বদলে জুটছে চোখ রাঙানি, হুমকি, ধমকি। ধুপগুড়িতে ধর্ষণের পর নৃশংস ভাবে খুন হওয়া হতভাগীর মা বাবাকে সহানুভূতির বদলে সুবিচারের আশায় প্রতিবাদীদের দলে সামিল হওয়ার অপরাধে মিথ্যে মামলায় জেল খাটতে হয়েছে, গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছে।

সেই বাম জমানার মতো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠে, তা সম্ভব না হলে সমাজের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ বিক্ষোভের গায়ে বিরোধী রাজনীতির রং দিয়ে বিষয়টিকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস করা হয়। আইন আইনের পথে চলবে বলে হুঙ্কার ছাড়া হয়। যেমন কিনা কামদুনির প্রতিবাদী টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়ালদের খোদ মুখ্যমন্ত্রী মাওবাদী তকমায় ভূষিত করার প্রয়াস করেছিলেন। শুধু ভয়ঙ্কর ঘটনার সূত্রেই নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ বিক্ষোভ দাবিয়ে রাখার দৃশ্যেও কামদুনি, জামুরিয়া, ধুপগুড়ি, সিতাই-য়ের পরিস্থিতির মধ্যে কোনো

তফাত নেই।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে যে কোনো ধরনের অপরাধের সরাসরি সম্পর্ক আছে এটাই প্রচলিত ধারণা। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায় মূলত প্রশাসনের বকলমে শাসক দলের। সে জন্যই সংবাদ শিরোনামে আসা অপরাধের ঘটনাগুলিতে শাসক দল অস্বস্তিতে পড়ে। এই সমস্ত অপরাধকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ এই অস্বস্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ক্ষমতাসীন দলের এই অস্বস্তি বিরোধীদলগুলিকে স্বস্তি দেবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সামাজিক বিপর্যয়ের প্রতীক বলে চিহ্নিত হওয়ার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধের ঘটনা সমূহকে ইস্যু করে, সমাজে বর্ধিত অপরাধ প্রবণতাকে ইস্যু করে দলমত নির্বিশেষে সবাই এক মঞ্চে আসতে পারে না।

ধর্ষণ ও হত্যার মতো বিরলতম ভয়ঙ্কর ঘটনাও রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ওঠে। বাম জমানায় অভিযোগ উঠতো সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী লুটপাট অগ্নিসংযোগ খুনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণকেও বিরোধীদের শায়েস্তা করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের ছেলেদের দিয়ে ধর্ষণ করিয়ে দেওয়ার হুমকির ভিডিও ক্লিপ সামনে আসার ঘটনা প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির রাজপথের পথিক পাল্টালেও পথ পাল্টায়নি।

ক্ষমতার রাজনীতির এই নিম্নগামিতা ও দেউলিয়াপনা অপরাধীদের কতটা বেপরোয়া করে তুলতে পারে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল কামদুনি ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় ঘোষণার দিন। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখলো দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর হাকিমের হুকুম শুনেই আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধীরা সর্বসমক্ষে প্রতিবাদী মহিলাদের দিকে ক্রুরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছে 'আসছি, ওই ভাবে মারব তোদেরও'। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে অপরাধীদের এই দুঃসাহসের উৎসও কিন্তু এই নোংরা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিজাত সুরক্ষার হাতছানি।

সিতাইয়ের ভোলাচাতরার বর্ণা বর্মন (আসল নাম নয়) গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় তিন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এক্ষেত্রে আইন কঠোরভাবে বলবৎ হবে, দোষীদের চরম শাস্তির জন্য সম্ভাব্য সবরকম আইনি প্রক্রিয়া চলবে, তবুও প্রতিবাদ বিক্ষোভের যে প্রয়োজন আছে তা ওই গ্রামে গেলেই বোঝা যাবে।

ঘটনার দিন রাতে লোকনৃত্য শিল্পী বলে পরিচিত সবার আদরের পিতৃহীন দশম শ্রেণীর প্রাণচঞ্চল মেয়েটি ওর নিজের ভাঙ্গাচোরা ঘরে অন্যদিনের মতোই ঘুমিয়ে ছিল। ২০ জানুয়ারি সকালবেলা বাড়ির পাশেই কলাবাগানে ওর ক্ষত-বিক্ষত নগ্ন মৃতদেহ পাওয়া গেল। গ্রেপ্তার হওয়া তিন অভিযুক্ত হজরত (২৬), রফিকুল (২৮) ও ওয়াশিম আক্রামের মধ্যে দ্বিতীয় জন বর্ণার নিকটতম প্রতিবেশী। এখন ওই গ্রামে প্রতিটি রাতই মূর্তিমান আতঙ্ক। নিজের ঘরে ঘুমুতে গেলেও আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না গ্রামবাসীদের।

এই পরিস্থিতিতে ওই পরিবার ও গ্রামের মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর জন্য ভরসা ও সাহস যোগানের প্রয়োজন। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের সক্রিয়তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা শাসক দল বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বলে ধরে নিচ্ছে। ফলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ তো দূরের কথা তৃণমূল বিরোধী বলে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ওই বাড়িতে পা দিতেও অনেকে ভয় পাচ্ছেন।

শাসকদলের লোকেরা আইন আইনের পথে চলবে বলে যতই গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলুক না কেন প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার ফাঁকফোকর, দীর্ঘসূত্রিতা ও রাজনৈতিক মাখামাখি এত বেশি যে একক ভাবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা নামক দুরারোগ্য ব্যাধিটির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মতো সমাজের নিজস্ব সামর্থ্য ও রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কমে এলেই অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়।

কামদুনি দেখিয়ে দিয়েছে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনায় প্রতিবাদ বিক্ষোভের মাধ্যমে সমাজকে জাগ্রত রাখার প্রয়োজন আছে। এতে আইনি প্রক্রিয়া যেমন স্বাভাবিক গতিতে দোষীদের শাস্তির চরম সীমানা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে তেমনি চলমান ব্যবস্থার প্রতি ভুক্তভোগীদের হারিয়ে ফেলা আস্থাও ফেরানো যায়।

ধুপগুড়ি ও সিতাইয়ের গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের জেরে যারা প্রভাবিত সেই সমস্ত চলমান ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলা মানুষগুলির সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে ওরা রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মহিলা মমতা ব্যানার্জিকে নয়, কামদুনি আন্দোলনের দুই প্রধান মুখ মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়ালকে কাছে পেতে চাইছে।

ভয়ঙ্কর অপরাধগুলির ক্ষেত্রে সমাজে ক্ষোভ বিক্ষোভ আছড়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। অবিভক্ত ভারতেও ধর্ষণ অপহরণ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত আছে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে রংপুরে বেশ কিছু গণধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের ভেতরে তৈরি হওয়া হতাশাকে দূর করতে সে সময় উত্তরবঙ্গের প্রবাদপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মা এক ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে গাইবান্দা মহকুমার পলাশবাড়ির বরদাসুন্দরী, কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরী থানার কুমারপাড়া গ্রামের রাধারানি বর্মন, রংপুর থানার কাটিদুয়ার গ্রামের ঘৃতকুমারী বৈষ্ণবী, কান্দুরী বর্মনের মতো মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা দলবদ্ধ ভাবে ধর্ষিতা ও অপহৃতা হিন্দু মহিলাদের আদালতে আইনি সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষত্রিয় সমিতিতে আশ্রয় দিয়ে এদের লাঠি, ছোরা চালানো প্রশিক্ষণ, কুস্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই ধরনের জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য তিনি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন। ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি আবেগতাড়িত ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, দুষ্টের অত্যাচারে নিপীড়িত নারীর আর্তনাদ আকাশ বাতাস জ্বালাময় করে তুলছে। ভাই ক্ষত্রিয় জাগো, বীর নব যুবক উঠ, নিদ্রা ছাড়, মাতৃজাতি রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হও। ওই অধিবেশনেই তিনি নারীরক্ষা সেবক দল গঠনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ক্ষত্রিয় সমিতিতে নারীরক্ষা বিভাগও খুলেছিলেন। বড় ধরনের জনজাগরণ গড়ে তোলার জন্য রচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক ডাংধরি মাও গান ও কবিতা।

আজকের সিতাই, কামদুনি, কৈজুড়ি, খিদিরপুর, সন্দেশখালি, স্বরূপনগরের মতো সে সময়ও ধর্ষকরা মুসলমান ও ধর্ষিতারা ছিলেন সবাই হিন্দু। ধর্ষক ধর্ষিতার ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরার সঙ্গে একমত না হয়ে নারীধর্ষণ, অপহরণ ও খুনের ঘটনায় যাঁরা শুধুমাত্র জৈবিক কারণ দেখতে পান তাঁরা কিন্তু দু'একটি বিরল ব্যতিক্রমী ঘটনা (এই লেখকের সেরকম ঘটনা জানা নেই) ছাড়া ধর্ষক হিন্দু ধর্ষিতা মুসলমান এটা দেখাতে পারবেন না। এর থেকে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় এই সমস্ত ধর্ষণ ও খুনের পেছনে জৈবিক কারণ ছাড়াও নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য, ধর্মীয় দর্শন ও প্রেরণা কাজ করে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দু নারী ধর্ষণ খুন অপহরণকে পাকপন্থী মুসলমানরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল যাতে হিন্দুরা দেশভাগ মেনে নিতে বাধ্য হয়। গত শতাব্দীর শুরুর দিকটিতে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি থাকলেও দেশভাগের আগে ও পরের সময়গুলিতে যখন হিন্দু নারীধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা মহামারীর আকার ধারণ করেছিল তখন হিন্দু সমাজের মধ্যে মনীষী পঞ্চাননের মতো নেতৃত্ব ও রুখে দাঁড়ানোর শক্তি কোনোটাই ছিল না। যার পরিণাম দেশভাগ। আজকের পরিস্থিতির মধ্যেও দেশভাগের মতো বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটানোর মতো সমস্ত ধরনের উপরকণ ও রসদ মজুদ আছে। সক্রিয় আছে দেশি বিদেশি অপশক্তিও। ক্ষুদ্র রাজনীতির নেশা কাটিয়ে সাহস করে কামদুনির মতো রুখে দাঁড়াতে না পারলে সর্বনাশ অনিবার্য। ▮

কাদের গুরু আফজল গুরু?

শেখর সেনগুপ্ত

রাজনীতিতেও হনুমানটুপি থাকে। বদনে সেঁটে থাকে মুখোশ। কিন্তু বিশ্বাসের পুঁজি যখন তলানিতে, মজ্জাগত দৈন্য যখন অতি প্রকট, তখন এই 'মহান' 'সেন্টপল'রা হারিয়ে বসেন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও। রসনা বে-লাগাম হওয়ায় উদ্ভট কালোয়াতিতে কান ঝালাপালা করিয়ে ছাড়েন। টুপি ও মুখোশ মাটিতে গড়াগড়ি খায়। এ জাতীয় কুকম্মের বহর আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি প্রায় প্রতিদিন। আমার তো শঙ্কা হয়, কোনোদিন হয়তো শুনব, এই 'দেশপ্রেমী'দের রসনা থেকে নির্গত হচ্ছে সেই দেশের তরে অনাময় উন্নতিবিধানের মোক্ষম দাবি— 'শহিদ আফজল গুরুকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হোক।'

আপনার আমার পিলে চমকালেও করার কিছু নেই। আমরা কেবল দুর্বলচেতা নই, আদত দেশপ্রেমীকেই চিনতে পারি না। এঁরা চিনেছেন। অন্তহীন শ্রদ্ধা ও পেয়ারের সঙ্গে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন তাঁদের গুরু আফজল গুরুর শ্রীচরণে।

সারা বছর ধরেই তো আমাদের মতন অর্বাচীনরা তথাকথিত কত মহামানবের জন্ম কিংবা মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করে থাকি। শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, গুরুনানক, যীশু, শিবাজী, নেতাজী, গান্ধী, আম্বেদকর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ থেকে শুরু করে এপিজে কালাম অবধি। এবার ওই দেশপ্রেমী মানবপ্রেমীরা হুড়মুড় করে এসে পড়লেন— এই বায়না নিয়ে যে অতঃপর আরও একটি নামকে ওই তালিকায় স্থান দিতেই হবে। তিনি হলেন প্রকৃত ভারতপ্রেমী মহাসাধক আফজল গুরু। গুরুর সম্মানে দেশজুড়ে তাঁদের যে নর্তন চলছে, তাকে রাজনীতির স্ট্রিপটিজ বলতে আর বাধাটা কোথায়?

তো ওই গুরুর গুরু আফজল গুরুর মহান অবদানটা কী? তিনি এই পোড়া দেশের জন্য কেন ও কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন? গুরুর মুখ্য পরিচয় একটাই। একটি ছোট্ট চিরকুটই যথেষ্ট তা প্রকাশ করতে। তিনি বিশ্বময় তাণ্ডব চালাবার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত একটি ইসলামিক জঙ্গী গোষ্ঠীর আদরের পোষ্যপুত্র ছিলেন। তিনি সদলবলে বর্ডার পেরিয়ে খোদ দিল্লীতে ঢুকে আমাদের 'অসার' গণতন্ত্রের হৃৎপিণ্ড সংসদ ভবনটাকেই চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। সংসদের ভেতরে যাঁরা তখন ছিলেন, সেই সমস্ত

নির্বাচিত সাংসদ, মন্ত্রী, স্পিকার প্রমুখদের নির্বিচারে মায়ের ভোগে পাঠাতে চেয়েছিলেন। এ চিত্রনাট্য অতিশয় থ্রিলিং। আজ আবার নতুন করে ম্যানহোলের ঢাকাটা খুলে গুরুপ্রেমীরা দেশজুড়ে সেই সুগন্ধকে ছড়াতে চাইছেন।

আল্লার অবিচার। তাই গুরু ধরা পড়ে যান। বিচারে তাঁর ফাঁসি হলো। এ হেন বীরপঙ্গুবের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের হককে নস্যাৎ করে দেবে প্রশাসন!! কত বড় স্পর্ধা!! আসুন, হে গুরুর শিষ্যবর্গ, আমরা সকলে মিলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। চোদ্দ শাক ও চোদ্দ প্রদীপ প্রথাকে সম্মান দিয়ে যাঁরা আমাদের গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনে বাধা দিয়েছে, তারা নিপাত যাক। নিপাত যাক। নিপাত যাক।

মহতী স্মরণসভার উদ্যোক্তা হয়েছিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জে এন ইউ) বামপন্থী ছাত্রসংগঠন। বামপন্থীরা এহেন ঐতিহ্যের বাহক হয়ে আছেন দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই। নেতাজীর মুণ্ডুপাত, বৃটিশের চরণে মাথা ঘষা, ক্ষমতায় একবার বসতে পারলে প্রণামী আদায়ের রেকর্ড করা, ধর্মনিরপেক্ষতার ব-কলমে সাম্প্রদায়িকতার বংশবিস্তার, মার্কসীয় আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধাকে চেটেপুটে খাওয়া...খোলসা করে বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। অধমের সঙ্কোচ হচ্ছে। নিতান্ত ছা-পোষা গৃহবাসী লেখককে অতখানি ছাড়পত্র দেবেই বা কে? মোদ্দা কথা, আফজল গুরুকে মাথায় তুলে নাচার প্রবণতা বামপন্থীদের রক্তে থাকবেই। প্রশাসনের মাথাটা মোটা। তাই এহেন গুরুবন্দনার হোতা কমরেড কানহাইয়া কুমারের কোমরে দড়ি লটকাল। সুযোগটাকে লুফে নিতে কুশলী ইয়েচুরির এক মুহূর্ত বিলম্ব ঘটেনি। আবার ইয়েচুরির গলাসাধা মানেই সোনিয়া-রাহুলের হৃদয়চুরি।...'ওই অতি ভৈরব হরষে'।...এখন তো তাঁদের মধুমাস চলছে। বামে কংগ্রেসে মাখামাখি গলাগলি হালফিল অনেকের কাছে, বিশেষত এই বঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটাতে, একেবারে যেন জপমালা হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা এবং কেন্দ্রে মোদী— এই দু'জনকে ঘায়েল করতে ইয়েচুরি-সোনিয়া-রাহুল ব্রহ্মাস্ত্রের খোঁজে বড় মরিয়া! এবার তাদের মিলন গুরুর আশীর্বাদ। বিজেপিকে ফরিয়াদি বানাবার যত রকমের আয়ুধ আছে, সবগুলিতেই এঁরা শান দিচ্ছেন। তা সে যতই দেশপ্রেম বিরুদ্ধ কিংবা অমনুষ্যোচিত হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। মাল ক্যাচ করবার এই তো মওকা। মাথায় আছে একটা চমৎকার হিসেব। দেশে মুসলমানদের সংখ্যা এখন কম-বেশি পঁচিশ কোটি। গুরু গুরু বলে এদের যদি এখন একটু টুসকি বা উস্কে দেওয়া যায়, আখেরে ভোটবাক্সে সোনা ফললেও ফলতে পারে। আবার তাঁরাই অশনি সংকেতও দেখতে পাচ্ছেন। বিহারে কিছুটা পিছু হটবার পর নরেন্দ্র মোদী আবার ক্রমশ ভাস্বর হয়ে উঠছেন। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলি তারই ইঙ্গিত। মহামুশকিল!

সেই আতঙ্কেই চলছে গুরু বন্দনা। মাঝে মাঝে প্রচারলোভী দু'-চার পিস বুদ্ধিজীবীকে ময়দানে নামিয়ে দিয়ে বাজারকে গরম রাখতেও হয়। আমার বিনীত প্রশ্ন সেই চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি :

আফজল গুরুরা যদি সংসদভবন উড়িতে দিতে সেদিন সক্ষম হোত, আপনারা তাহলে কোন দেশের নাগরিক হবার জন্য মুখিয়ে থাকতেন? যে দেশের প্রেসিডেন্ট হাফিজ সইদ এবং অর্থদপ্তরের সর্বময় কর্তা মহা ডন দায়ুদ ইব্রাহিম? ঘাড় কাত করবেন নাকি, স্যার?

তোবা! তোবা! ▮

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের বিজ্ঞান চর্চা

(দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

আর্যভট্টের কালে (পঞ্চম শতাব্দী) সকলে সংস্কৃত বলতে পারত না। বলত প্রাকৃত ভাষা কিন্তু সংস্কৃত বুঝত। তার প্রমাণ পাওয়া যায়— শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকে। ওইসব নাটকে সাধারণত সমাজের সভ্য ও শিক্ষিত পুরুষেরা সংস্কৃত বলেছেন, আর মেয়েরা ও সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত বুঝে প্রাকৃত ভাষায় উত্তর দিয়েছেন।

হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে ভাস্করাচার্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। তিনি ৩৬ বছর বয়সে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচনা করেন। তিনি সহ্য পর্বতের সমীপে বিজ্জবিক বা বিজাপুর নামক স্থানের শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ চূড়ামণি— মহেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র এবং ছাত্র ছিলেন। লীলাবতী নামক পাটিগণিত ও বীজগণিত সিদ্ধান্ত শিরোমণির দুটি অংশ। এরূপ প্রবাদ আছে যে, লীলাবতী ছিলেন ভাস্করাচার্যের বিধবা কন্যা। তাকে অঙ্ক শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাটিগণিত অংশ লিখেছিলেন। তাই তার নাম লীলাবতী। তবে এ প্রবাদ সত্য বলে মনে হয় না। কারণ ওই গ্রন্থে লীলাবতীকে কখনও কখনও কান্তা লীলাবতী উল্লিখিত হয়েছে। একই মেয়ে একই সঙ্গে কন্যা, সখা ও কান্তা হতে পারে না। লীলাবতী শব্দের অর্থ গুণসম্পন্না। এই অর্থে সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোড়ায়— ললিতা লীলাবতী শব্দ দুটির প্রয়োগ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, মাধুর্য গুণসম্পন্না কাল্পনিক কোনো চরিত্র তিনি ব্যবহার করেছেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণির একটি অধ্যায়ের নাম 'গোলাধ্যায়'। এই অধ্যায়ের শেষে তিনি লিখেছেন, 'কবি ভাস্কর, পণ্ডিতগণের সন্তোষপ্রদ, সুযৌক্তিক বাক্যবহুল, সহজবোধ্য, কুবুদ্ধি বিনাশক এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'

বীজগণিতের ইংরাজি নামটি বিদেশি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু হিন্দু গণিতজ্ঞদের আবিষ্কার। মহম্মদ মুশা আল খোয়ারেজমী (৮২৫ খৃ.) 'আলজেব-ওয়াল মোকাবেলা' নামে একটি বীজগণিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। সেই থেকে বীজগণিত পাশ্চাত্যের কাছে হয়ে যায় অ্যালজেব্‌রা। ম্যাকডোয়েলের মতে, 'যদিও বীজগণিত একটি আরবী নামে অভিহিত, তথাপি এ দান আমরা হিন্দুদের কাছ থেকেই পেয়েছি।' ঐতিহাসিক কোলব্রুক লিখেছেন, 'যে সময়

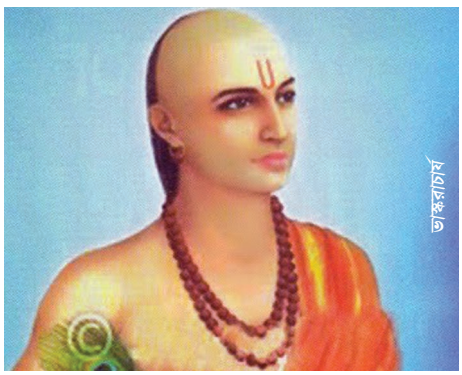

আরবরা বীজগণিতের কিছুই জানতো না সেই সময়ে অর্থাৎ আরবদের বহুপূর্বে হিন্দুরা বীজগণিত আবিষ্কার করে। মলিয়র উইলিয়াম্‌স্ এর কথায়, 'আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে কেবল যে বীজগণিতের মূল সূত্রটি পেয়েছিল তা নয়, তারা গলনাঙ্ক ও দশ ধরে গণনা পদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকেই পায়।'

ইউরোপ বীজগণিত শিক্ষা করেছে আরবদের কাছ থেকে। গ্রীক ও চীনেরা প্রাচীনকালে বীজগণিতের চর্চা করেছিল, তবু এই বিজ্ঞানে হিন্দুরাই বেশি ব্যুৎপত্তি লাভ করে। ড. বিভূতিভূষণ দত্তের মতে আধুনিক বীজগণিতের আকার ও ভাব মূলত হিন্দুদেরই কীর্তি। হিন্দুরা বীজগণিত ও অব্যক্তগণিত— এই দুই নামেই এই শাস্ত্রকে অভিহিত করে। অব্যক্ত গণিতের অর্থ অজ্ঞাত রাশির গণনা বিজ্ঞান, আর বীজ শব্দের অর্থ হলো মূল বা কারণ। ঋণাত্মক সংখ্যা (Negative number) প্রয়োগের জন্য জগৎ হিন্দুদের কাছে ঋণী। ধন ও ঋণ সংখ্যাকে ঋক্ ও অণৃক বলা হোত।

বীজগণিতে সমীকরণ শব্দও প্রথম হিন্দু গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃ.) আবিষ্কার করেন। হিন্দুগণিতে চাররকমের সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) একবর্গ সমীকরণ, (২) অনেকবর্গ সমীকরণ, (৩) মধ্যমাপূরণ, (৪) ভাবিত। ইংরাজিতে আমরা বলি Simple, Simultaneous, quadratic এবং equation involving products of two unknown quantities. এগুলির মধ্যে মধ্যমাহরণ প্রণালী আবিষ্কার করেন শ্রীধরাচার্য। বর্গসমীকরণে অজ্ঞাত সংখ্যার ধন ও ঋণ এই দুটির মূল্য বের হতে পারে, এটা হিন্দু গণিতজ্ঞ পদ্মনাভ আবিষ্কার করেন। উল্লেখ্য যে, শ্রীধরাচার্য ও পদ্মনাভ প্রণীত গণিতগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তবে ভাস্করাচার্যের (দ্বাদশ শতাব্দী) গ্রন্থে দুই গণিতজ্ঞের ওই দুই আবিষ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্গসমীকরণে ভাস্করাচার্যের প্রণালী ও শ্রীধর আচার্যের প্রণালী ভিন্ন। ভাস্করাচার্য প্রণীত প্রণালী বর্তমানে প্রচলিত প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ। আর্যভট্টের (পঞ্চম শতাব্দী) গ্রন্থে কুট্টকের সমাধান সূত্র পাওয়া যায়। কুট্টক হলো অনিশ্চিত একবর্ণ সমীকরণ (indeterminate equation of first degree)।

আধুনিক কালে ১৬২৪ (সপ্তদশ শতাব্দী) সালে বাকেট ডি মে জিরিয়াক ওই নিয়ম পুনরায় আবিষ্কার করেন এবং অয়লার ও লাগ্রাঞ্জে তার উন্নতি সাধন করেন। উপরোক্ত ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের প্রণালী ও পঞ্চম শতাব্দীর হিন্দুগণিতজ্ঞ আর্যভট্টের প্রণালী ফলত একই। ভাস্করাচার্য indeterminate equation of the second degree-র সাধারণ সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন।

অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা ক্যাজোরী লিখেছেন,— 'অনিশ্চিত সমীকরণ বিদ্যায় হিন্দুরা বেশ একটা সহজ নিজস্ব ভাব দেখিয়েছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, এ বিষয়টি গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফ্যানটাসের খুব প্রিয় ছিল এবং তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সমাধান করতে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের এই সূক্ষ্ম বিভাগে সাধারণ আবিষ্কারের গৌরব হিন্দুদেরই।"

হিন্দুরা বীজগণিতের সূক্ষ্ম গণনা জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেছে। কোলব্রুক লিখেছেন, 'যদি একথা স্বীকার করা যায় যে, হিন্দু ও আলেকজান্দ্রিয়ার দুই গণিতবিদ (আর্যভট্ট ও ডায়োফ্যানটাস) প্রায় সমসাময়িক তবুও হিন্দু বীজগণিতজ্ঞের পক্ষে একথা বলতেই হবে যে, এ বিষয়ে তিনি অধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

সংকলক : অমলেশ মিশ্র

পঞ্জাবের গর্ব বিচারক শ্রুতি কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘড়িতে তখন সকাল ৯টা। সবে আদালত চত্বরে ভিড় জমতে শুরু করেছে। সুরিন্দর কুমারের চায়ের দোকানে বসা দু'জন আইনজীবী নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই সুরিন্দরের। আচমকা আরও এক উকিল দোকানে এসে তাদের আলোচনায় যোগ দেন। তখন সুরিন্দরের কানে এলো, 'নতুন বিচারক আসছেন অগামীকাল। নাম শ্রুতি কুমার'। মুহূর্তের মধ্যে তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো তাঁর মেয়ে শ্রুতি নয় তো? পরে বুঝতে পারলেন যে আদালত চত্বরে বসে তিনি চা বিক্রি করেন সেই আদালতেরই

বাবার সঙ্গে শ্রুতি কুমার।

বিচারক হয়ে আসছে তাঁর ২৩ বছর বয়সী মেয়ে শ্রুতি।

পঞ্জাবের জলন্ধর জেলার নাকোদার গ্রামের মেয়ে শ্রুতি কুমার। শৈশবে পড়াশোনার প্রতি তাঁর একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে বাবা সুরিন্দর কুমার তাঁকে স্কুলে ভর্তি করেন। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে মেয়েকে পড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য না থাকার জন্যে তিনি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন। জলন্ধর আদালতের বাইরে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান চালিয়ে যা আয় হয় তা দিয়েই সংসার চালান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে মেয়েকে ওকালতি পাশ করিয়েছেন তিনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিস (বিচার ব্যবস্থা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিচারক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রুতির এই কৃতিত্বে তাঁর বাবা-মা শুধু নন, স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশীও আনন্দিত।

স্টেট পাবলিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন শ্রুতি। এরপর জলন্ধরের জি এন ডি ইউ প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হন। তারপর পাটিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল এম পাশ করেন। তখন থেকেই তিনি আইনি বিষয়ক পরীক্ষায় বসতে শুরু করেন। পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিস (বিচারব্যবস্থা) পরীক্ষায় প্রথমবার বসেই উত্তীর্ণ হন। এর জন্যে এক বছরের বিশেষ কোচিং নিতে হয়েছিল তাঁকে। বর্তমানে জলন্ধর আদালতের বিচারক আসনে তিনি। এই আদালত চত্বরেই তাঁর বাবা সুরিন্দর কুমারের চায়ের দোকান। এ প্রসঙ্গে শ্রুতি জানান, আমি বিচারক হতে চেয়েছিলাম। পরীক্ষায় বসে তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হই।' নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরে যতটা আনন্দিত শ্রুতি তেমনি তাঁর এই কৃতিত্বে তাঁর পরিবারও গর্বিত। শ্রুতি মনে করেন দেশের সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইচ্ছা করলে মেয়েরাও পারে উচ্চস্থান দখল করতে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার বন্ধু হরপ্রিত কৌর সিধুও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর বাবা একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর।'

দারিদ্র্য যে তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি তা আজ প্রমাণিত। মনের জোরের কাছে দারিদ্র্য হার মেনেছে। শ্রুতির লক্ষ্যপূরণে একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা দুটোই ছিল। দু-বেলা দু-মুঠো খাবার জুটেছে কী জোটেনি সেদিকে মন না দিয়ে নিজের স্বপ্নপূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল এই মেয়েটি। শ্রুতির সাফল্যের খবর আদালত চত্বরে পৌঁছানো মাত্রই বহু ব্যক্তি এসে সুরিন্দরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেছেন। কারণ সুরিন্দরের জীবনের যে সংগ্রাম তা সত্যিই অবিভূত হওয়ার মতো। কষ্ট করে মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়ে আজ তিনি তাঁকে যে জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন তা সত্যিই অবাক হওয়ার মতো। শ্রুতির এই সাফল্যে রাজ্যসভার সাংসদ এবং বিজেপির সহ-সভাপতি অবিনাশ রাই খান্না বলেন, 'পঞ্জাবের গর্ব শ্রুতি'। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

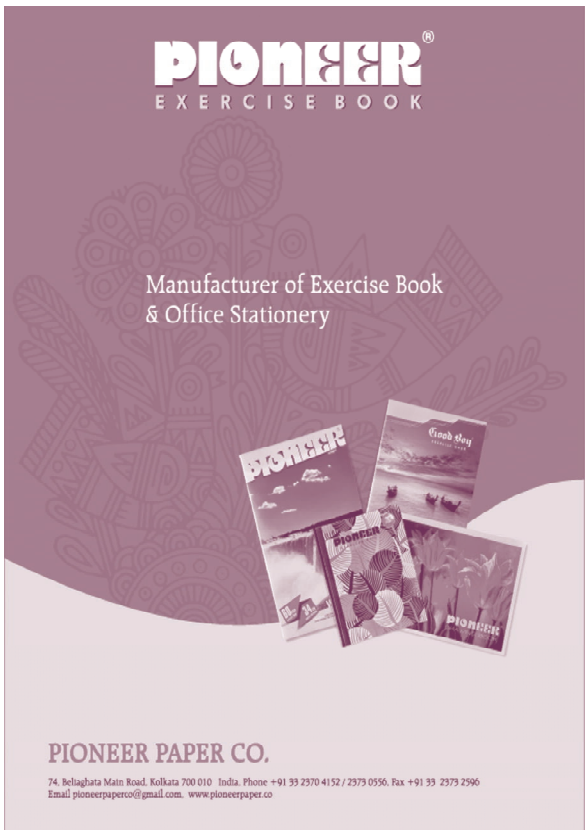

‘ আমাদের সকলের কাজ একটাই, সমগ্র জাতির শিক্ষাদান। পরস্পরের প্রতি, দেশের মাটির প্রতি একত্বের অনুভূতি নিয়ে দেশের সকল অংশে শিক্ষাদান। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই শিক্ষাদান পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপায়ে হবে, একথা মনে করা ভুল। জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন— প্রত্যেক শিক্ষকের ‘পাঠ’ দেবার এই হবে মূলসূত্র— এই হবে নিয়ম।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

দাঁতের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

কথায় বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না মানুষ। দাঁত আমাদের পুষ্টিসাধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর সুন্দর দাঁত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সাধারণত একটা মানুষের ২০টা দুধে দাঁত আর ৩২টা স্থায়ী দাঁত থাকে। এর মধ্যে ২৪টা দাঁত ১২-১৩ বয়সের মধ্যেই উঠে যায়। বাকি ৪টি দাঁত অর্থাৎ ৩য় মোলার বা শেষ মোলার ওঠে ১৮-২৫ বছরের মধ্যে। ওই সময় 'লেট-টিন'-এ মানুষ ছেলেমেয়েরা বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে অর্থাৎ ম্যাচিওর হয়। তাই ৩য় মোলার (৪ দাঁত)-ই হল আক্কেল দাঁত।

প্রথম প্রথম আক্কেল দাঁত পুরোটা নাও উঠতে পারে। আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত। আদিম যুগের মানুষের মুখের গঠন ছিল অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো, মুখটা সামনের দিকে এগিয়ে থাকত, তখন ৩-৪ ১২টা মোলার বা পেশা দাঁতই চেবানোর কাজে লাগতো। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মুখের গঠন সুগঠিত। খাবার ধরনও পাল্টে গিয়েছে। ফলে ৩য় মোলার বা পেশার দাঁত প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছে। দাঁত ওঠার জায়গাও কমে গিয়েছে। ফলে আক্কেল দাঁত ওঠবার সময় নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করে। 'ওপারকুলাইটিস' বলে একটি সমস্যা আছে অর্থাৎ আক্কেল দাঁতের ওপর মাড়ির যে অংশ থাকে তাকে ওপারকুলাম বলে।

যেহেতু দাঁতের ওপর মাড়ির অংশটা খানিকটা থাকে তার ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এই প্রদাহ হওয়াকেই ডাক্তারি ভাষায় ওপারকুলাইটিস বলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাবার জমে (দাঁত ও ওপারকুলারের মধ্যে) পচে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য হয়ে থাকে। এছাড়া পেরিকরোলাইটিস বলেও একটা সমস্যা হয় যা আক্কেল দাঁতের ক্রাউনকে ঘিরে থাকা মাড়ির অংশের (হাড় ও চোয়ালের সফ্‌ট টিস্যু) প্রদাহ যা আশেপাশের জায়গাগুলিতে জমতে পারে ও মুখ ফুলিয়ে দেয়। জ্বরও আসে, যন্ত্রণা হয় কাছাকাছি লিম্পনডস্ ফুলেও ওঠে। এছাড়াও হাড়ের মধ্যে পুরোপুরি থেকে যাওয়া সিস্ট অথবা টিউমার হওয়া অথবা না ওঠা আক্কেল দাঁত থেকে নানারকমের অসুবিধা চোয়ালের হতে পারে অর্থাৎ চোয়ালে সিস্ট হতে পারে।

দাঁতের একটি রোগ হলো দাঁতে পোকা হওয়া। দাঁতে পোকা কথাটি সাধারণের কাছে পরিচিত হলেও তা আসলে দাঁতের ক্ষয়, যে রোগে দাঁতের ক্যালসিফায়েড টিস্যু নষ্ট হয় ও জৈব ও অজৈব অংশ ধ্বংস হয়। এই রোগ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে দেখা যায়। দন্তক্ষয়ের কারণ না জানা গেলেও কয়েকটি বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যেমন খাদ্যের শর্করা অংশ, কয়েকটা মাইক্রো অরগানিজম (জীবাণু) অম্ল ডেন্টাল প্লাগ ইত্যাদি।

দাঁতের ক্ষয় রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছোটদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শমতো কয়েকটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। খাওয়ার পর মুখ ভালোভাবে ধোওয়া এবং সকাল ও রাতে খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হলো লাক্ষণিক চিকিৎসা। তাই যে কোনো ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। কয়েকটি ওষুধের উল্লেখ করা হলো : দাঁতে ব্যথা, ঠাণ্ডা লেগে ব্যথা হলে— একোনাইট। মাড়িতে ঘা, দাঁত নড়লে--- ক্যালি-ফস। মাড়ি ফুললে--- বেলোডোনা। ঠাণ্ডা জল খেয়ে দাঁতে ব্যথা বাড়লে— স্ট্যাফিসাগ্রিয়া। ঠাণ্ডায় যদি যন্ত্রণা কমে তবে— ক্যামোমিলা। গরম কিছু খেলে যদি যন্ত্রণা বাড়ে সেক্ষেত্রে— ন্যাট্রাম-সালফ। দাঁতে পোকা অথবা দন্তক্ষয়ে— প্লান্টাগো এবং কিয়োজোট বিশেষ কাজ দেয়। তুলোয় করে দাঁতের গোড়ায় লাগালে উপকার পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ২০০ শক্তির ওষুধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়। দাঁত দিয়ে পুঁজ পড়লে হিপারসালফার এবং এমেটিন ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কফিড়া ক্রুড়া দাঁতের একটি ভাল ওষুধ। বাচ্চাদের দাঁত উঠতে দেরি হলে— ক্যালকেরিয়া ফস ৩০, যে সময় বাচ্চাদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় তাদের ইপিকাক ২০০ দিলে সুস্থ থাকবে।

আর্সেনিক— রোগীর অস্থির বেদনা দিন বা রাতদুপুরে বৃদ্ধি, তাপে উপশম। ঠাণ্ডাতে দাঁতগুলো শিথিল ও লম্বা হয়েছে অনুভব হয়।

তীব্র দাঁতের বেদনায় মহৌষধ-ক্যামেমিলা।

দাঁতের ওষুধের থেরাপিউটিক্স আক্কেল দাঁত ওঠার সময় যন্ত্রণা— ক্যাল্ক-কার্ব, ম্যাগ-কার্ব, চিত্তন্যানথাস চেরি, সাইলেসিয়া ঠাণ্ডা জলে উপশম- আর্স, লাইকো, মাক, নাক্স, সেরিনাম, রডোরসি, সিলিকা।

ঋতুকালে দন্তশূল আর্স-ক্যামোমিলা, নেট্রামমিউর, পালস, সিপিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড।

ধূমপাম উপশম— মার্ক, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রাম সালফ।

দাঁতে দাঁত ঘষলে উপশম— ফাইটোলোক্কা।

ঠোঁট ঢেকে থাকলে উপশম--- নাক্স সিলিকা, ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুলে বৃদ্ধি-সালফার।

এছাড়াও আরও অনেক ওষুধ আছে। হোমিওশাস্ত্রে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

ভারতাত্মার সন্ধানে ফেসবুকের জনক

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেসবুক আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে পানীয় জলের মতোই একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই আছে যারা বই পড়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে। এদের কাছে বুক মানে এখন ফেসবুক। প্রতি বছর মহাসমারোহে বুক ফেয়ার হয়, প্রচুর ভিড় হয়। কিন্তু প্রকৃত বইপ্রেমীর সংখ্যা হাতে গোনা। নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দেখা যায় এখানে ওখানে জাঁকিয়ে বসে আড্ডায় রত, চা কফি সহযোগে। কান পাতলেই তাদের কথোপকথন শুনতে পাওয়া যায়। উদাহরণ দিচ্ছি—

মার্ক জুকেরবার্গ

—'কি রে অ্যাপস্ (পৈতৃক নাম অপরাজিতা) তোর বয়ফ্রেন্ডকে ফ্রেন্ড-রিকোয়েস্ট পাঠালাম, অ্যাকসেপ্ট্ করল না কেন রে? তুই বারণ করে দিয়েছিস?

আরেকটি উদাহরণ—

'এই জানিস আমার বার্থডের ছবিটার না দু'শোটা লাইক এসেছে।'

আপনি হয়ত চট করে বুঝতে পারবেন না এরা কী বিষয়ে বাক্যালাপে রত। বিষয়টা হচ্ছে ফেসবুক। এরা নিজেদের রবীন্দ্রভক্ত বলে দাবি করে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি রচনার নাম করতে বলুন, এরা সমস্বরে বলে উঠবে 'চারুলতা'। এরা টেনিদার নাম শুনেছে, কিন্তু ঘনাদা বা টেনিদার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই। এরা বাঙালি হয়েও বাঙালি নয়। এদের মুখের ভাষা বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। শহুরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এসেছে, তাই এদের কথায় বাংলার থেকে ইংরেজির প্রাধান্য বেশি। এর ফলে যারা ইংরাজি বলায় বিশেষ দক্ষ নয়, তারা একটা হীনমন্যতায় ভোগে। আসলে দোষ নবীন প্রজন্মের নয়, এদের স্কুল কলেজের পাঠ্যতালিকায় 'ভারতীয়ত্ব' অনুপস্থিত। নিজের দেশকে ভালবাসা, তাকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা একান্ত জরুরি ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি। এর জন্য নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা দায়ী নয়। যাঁরা সিলেবাস তৈরি করেন এবং তাঁদের যাঁরা নির্দেশ দেন, তারা দায়ী। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা 'ভারতীয়ত্ব'কে 'হিন্দুত্ব' বলে স্বীকার করেন না, বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, রামায়ণ, মহাভারতকে হিন্দুদের বই বলে ব্রাত্য করে রেখে দেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার কথা ছিল, যেটা জাতিগঠনের জন্য জরুরি ছিল, তা হয়নি। এরই ফলশ্রুতি আজকের তরুণ প্রজন্ম। এদের অধিকাংশই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বিশ্বাসী। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শাড়ি কীভাবে পরতে হয়, জানে না। কারণ তারা জিনস্, স্কার্ট, টপ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত। ইনল্যান্ড লেটার কাকে বলে জানে না, পোস্টকার্ড বলতে বোঝে পিকচার-পোস্টাকার্ড, সাধারণ পোস্টকার্ড কখনও চোখে দেখেনি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা।

উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভ এবং হরিদ্বার অর্ধকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল:-

অমৃতকুম্ভমেলার কথা

— লালঠাকুর

(হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী একত্রে)

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

প্রকাশক : জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.

কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, ব্লক-৪, স্টল নং -৩৩, কলিকাতা-৭৩

প্রাপ্তিস্থান : চেতনা বুক স্টল, আরামবাগ (গৌরহাটীর মোড়) হুগলী

যোগাযোগ : বিমল মুখোপাধ্যায়, মো:- ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮, ৮৩৪৮৮০৬১৫৩

'ঠাকুরমার ঝুলি'র নাম শোনেনি, কিন্তু হ্যারি পটার মুখস্থ। ঝোলভাত, রুটি-তরকারি, দই-চিঁড়ে জাতীয় খাদ্যে তাদের অরুচি, তারা ম্যাকডোনাল্ড, কাফে কফি ডে বা কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন দারুণ পছন্দ করে। এই ফেসবুক প্রজন্ম জানে না ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতীয় দর্শন। ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে বহু মননশীল মানুষ এ দেশে ছুটে এসেছে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী মন্দিরগুলি দর্শন করেছে, যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে, সেই অভিজ্ঞতা তারা তাদের দেশে ফিরে গিয়ে তাদের সৃষ্টিধর্মী কাজে লাগিয়েছে। ভারতের কৃষ্টি তাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে নতুন নতুন সৃষ্টির সাহায্যে মানব সমাজকে সমৃদ্ধ করতে। আজও সেই ধারাটি অব্যাহত।

এই প্রসঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর উন্নততর প্রযুক্তি ফেসবুক ও অ্যাপ্‌লের কথা বলতে চাই। এই রচনার শুরুতে ফেসবুকের কথা বলা হয়েছে। দেখেশুনে মনে হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণই ফেসবুক খুলে বসে আছে। কিন্তু যেটা সম্ভবত তারা জানে না, সেটা হলো অ্যাপলের জনক স্টিভ জোবস্ এবং ফেসবুকের জনক মার্ক জুকেরবার্গ দু'জনেই তাঁদের সাড়াজাগানো সৃষ্টির প্রাক্কালে ভারতে এসেছিলেন। নৈনিতালের কাঞ্চীধামের হনুমানজীর মন্দির দর্শন করে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির কাজে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁরা তাঁদের সংস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগিয়েছিলেন। একথা আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই। আবার কেউ কেউ হয়ত বলে উঠবেন— 'যত্তো সব বাজে কথা'। তাঁদের জ্ঞাতার্থে মার্ক জুকেরবার্গের নিজের কথা উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন—

'ফেসবুকের ইতিহাসে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। এই ব্যাপারটা আমি ইতিপূর্বে জনসমক্ষে আনিনি এবং খুব কম সংখ্যক লোকই এটা জানে।' তারপর তিনি আরও বলছেন—

'ফেসবুকের ইতিহাসের প্রথম দিকে যখন কোম্পানির এতটা ভালো অবস্থা ছিল না, আমরা বেশ সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম সেই সময়টায়। বহু মানুষ তখন ফেসবুক কিনে নিতে চাইছিল আমাদের অবস্থা দেখে। তারা ভেবেছিল যে আমরা কোম্পানিটা বিক্রি করে দেবার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত। তখন আমি দিশাহারা হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম আমার অন্যতম গুরু স্টিভ জোব্‌সের কাছে। তিনি আমাকে বললেন যে 'ভারতে যাও, তোমার সংস্থার উদ্দেশ্য তো বিশ্বের মানুষকে একসূত্রে বাঁধা, ভারতের ওই মন্দিরটি তোমাকে দর্শন করতেই হবে।' তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি নিজেও ভারতে গিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বখ্যাত 'অ্যাপল্' সৃষ্টির পূর্বাহ্নে। সেই সময় স্টিভ জোব্‌স তাঁর এই সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন, অ্যাপল্ এবং মানবসভ্যতার বিকাশ ছিল তাঁর ভাবনার বিষয়। সে কারণেই আমি ভারতে গিয়েছিলাম এবং প্রায় একমাস যাবৎ সেখানে ভ্রমণ করেছি। সেদেশের মানুষদের দেখলাম, কীভাবে তারা একে অপরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। আমি উপলব্ধি করলাম যে মানুষ যদি একে অপরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য একটা জোরদার মাধ্যম পায়, তাহলে পৃথিবীটা কত সুন্দর হয়ে উঠবে। মানুষ বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করবে এই উপলব্ধি আমাদের ফেসবুকের কাজটার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফেসবুক কোম্পানিটা গত দশ বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে তোলার সময় এই অভিজ্ঞতার কথা আমি সারাক্ষণই মনে রেখেছিলাম'।

সম্প্রতি মার্ক জুকেরবার্গ হাওয়াইয়ের কাওয়াই দ্বীপে ৩৫৭ একর জমি কিনেছেন তাঁর পরবর্তী প্রজেক্টের জন্য। এই প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে এখানেই 'Hinduism Today' নামক ত্রৈমাসিকীর মূল কার্যালয় অবস্থিত।

জানি না এই রচনটি নবীন প্রজন্মের কারও কাছে পৌঁছবে কিনা। তাদের মধ্যে একজনও যদি এই রচনাটি পড়বার পর ভারতীয় সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে জানব আমার পরিশ্রম সার্থক। *(লেখিকা প্রাক্তন অধ্যাপিকা)*

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের চিকিৎসক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ২০শে মার্চ ২০১৬ রবিবার, সকাল ৮-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত কেশব ভবনে, (৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬, মাণিকতলা, কলকাতা-০৬) বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

শুভেচ্ছাসহ—
ডাঃ সুকুমার মণ্ডল
সভাপতি

প্রতিনিধি শুল্ক ঃ ৩০০ টাকা

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

ডাঃ পি. কুণ্ডু, Mob : 98314 91658
ডাঃ এন. অধিকারী, Mob : 98317 10788
ডাঃ জে. কুণ্ডু, Mob : 94338 20185
ডাঃ বি. ঘোষ রায়, Mob : 90620 34891
ডাঃ এ. চৌধুরী, Mob : 96476 56245

কলকাতায় তারাসুন্দরী পার্কে কবাডি প্রতিযোগিতা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা পশ্চিমভাগ বিক্রম শাখার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো কবাডি প্রতিযোগিতা। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তারাসুন্দরী পার্কে সঙ্ঘ ও ক্রীড়াভারতীর যৌথ উদ্যোগে ২০টি দল এতে অংশগ্রহণ করে। সকাল দশটা থেকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে প্রতিযোগিতা। কলকাতার বিভিন্ন শাখা-সহ কয়েকটি স্কুলও এতে অংশ নেয়। তার মধ্যে সেরা হিসেবে ঘোষণা হয় শ্যামপুকুর শাখা। কলকাতা কর্পোরেশনের ২২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত শ্যামপুকুর শাখার স্বয়ংসেবকদের পুরস্কৃত করেন। ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে বিভাস মজুমদার বিজয় সায়ম শাখার স্বয়ংসেবকদের পুরস্কৃত করেন।

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারতমাতা পূজা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর গ্রামীণ শাখার উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি শান্তিভবনে ভারতমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আরোগ্য ভারতীর সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নিরঞ্জন সরকার। প্রদেশ সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুজিত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ হরষিত সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় জোয়ারদারকে উত্তরীয় এবং উপহার প্রদান করা হয়। প্রদেশের সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্যশিল্পী মেখলা রায় ও স্বপন ঘোষের যৌথ পরিচালনায় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান, গোপাল দাস বাউল ও চন্দ্রা দাসের লোকগীতি অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমিত ঘোষ দস্তিদার ও শেখর মণ্ডল। ওই জেলারই মন্দির বাজার শাখার ভারতমাতার পূজা অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার সভাপতি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ভারতমাতা পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বারুইপুর শাখার এই পূজা অনুষ্ঠানে প্রদেশ শাখার সহ-সভাপতি সজল চ্যাটার্জী ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অধ্যাপক কার্তিক হালদার ভারতমাতার পূজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন মৃণালকান্তি হাজরা ও সপর্ণা পুরকাইত। নাট্যকার বীরেন্দ্রনাথ পুরকাইত বক্তব্য রাখেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সৈকত দাস।

শোকসংবাদ

মালদহ নগরের উত্তরায়ণ প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অতুলচন্দ্র রজক গত ১১ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

স্বস্তিকার প্রাক্তন কর্মী চিত্তরঞ্জন পাত্র-র মাতৃদেবী সুধারানী পাত্র গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়ার মণ্ডলকুলি গ্রামে নিজ বাসভবনে ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ জেলা কার্যকারিণীর সদস্য স্বপন চৌধুরীর মাতৃদেবী রেবা চৌধুরী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও জামাতা-সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

অলিম্পিকে টেনিস ভরসা সানিয়া

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রিও অলিম্পিকের টেনিসে সানিয়া মির্জাই ভারতকে পরম নির্ভরতা দিতে পারেন এমনটাই মনে করেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় তথা কোচ জয়দীপ মুখার্জি। লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতিকে নিয়ে ডেভিস কাপে ওয়ার্ল্ড গ্রুপে ভারতকে একের পর এক বিগ ম্যাচ জিতিয়েছেন ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন জয়দীপ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেনিস সার্কিটের সব কিছু হাতের তালুর মতো চেনেন। কথাপ্রসঙ্গে অলিম্পিকে ভারতের সম্ভাবনা কী জানতে চাইলে এক মুহূর্ত না থেমে সটান বলে দিলেন যদি সানিয়া ও লিয়েন্ডার মিক্সড ডাবলসে জুটি বেঁধে খেলেন তবে পদক প্রাপ্তির সম্ভাবনা শতকরা একশোভাগ। কারণ সানিয়া ও লিয়েন্ডার যে ধরনের টেনিসটা খেলেন তা একে অপরের পরিপূরক। সানিয়া নেটের কাছে দাঁড়িয়ে চিপ অ্যান্ড চার্জ টেনিস আর লিয়েন্ডার বেসলাইনে দাঁড়িয়ে র‍্যালি, কোরহ্যান্ড বা ব্যাকহ্যান্ডে রিটার্ন পাসিং শট খেলতে সিদ্ধহস্ত। ডাবলসে এই কম্বিনেশনটাই এক্স ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে ম্যাচ জেতার ক্ষেত্রে আর গত একবছর দু'জনেই স্ব স্ব পার্টনারকে নিয়ে তিনটি করে গ্রান্ডস্লাম জিতেছেন।

আত্মবিশ্বাস, ফিটনেস, ফর্ম ও বড় মঞ্চে সফল হবার জন্য প্রত্যাশিত সঙ্কল্প, সর্বোপরি কিপার ইনস্টিংকট সব কিছুই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে দু'জনের খেলায়। সাফল্যের চূড়ায় অবস্থান করছেন। তাই যাবতীয় মনোমালিন্য ঝেড়ে ফেলে অলিম্পিকে যদি জুটি বেঁধে খেলেন তবে টেনিস পোডিয়াম ফিনিস করতেই পারে। অল ইন্ডিয়া টেনিস ফেডারেশন খুব শীঘ্রই দু'জনের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবে। আর তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে অলিম্পিকের মাসখানেক আগে থেকে দু'জনে জুটি বেঁধে এটিপি ট্যুর সার্কিটে গোটা কয়েক টুর্নামেন্ট খেললে ছন্দ ও গতি পেয়ে যাবেন। দু'জনে যেহেতু বিশেষজ্ঞ ডাবলস খেলোয়াড় আর কোর্টের পুরো অংশটা জুড়ে খেলেন তাই সানিয়া ও লিয়েন্ডার সব দেশের মিক্সডডাবলস জুটির তুলনায় খানিকটা এগিয়ে থেকে কোর্টে নামবেন। গত লন্ডন অলিম্পিকে যদি মহেশ ভূপতি পিছন থেকে কলকাঠি না নাড়তেন তাহলে এই জুটিকেই দেখা যেত অন্য ইংল্যান্ড ক্লাবের কোর্টে। আর সেক্ষেত্রে অন্তত একটি পদক চলে আসত।

চার বছর আগে লিয়েন্ডার আরো ভাল ফর্মে ছিলেন। সানিয়াও সার্কিটে উজ্জ্বল পদচিহ্ন মেলে উঠে আসছেন। এই অবস্থায় দু'জনের জুটি একটা চমৎকার ভারসাম্য তৈরি করে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বজায় রেখে ম্যাচ বের করে নিতে পারত। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ভারতীয় টেনিসকে হাসির খোরাক করে তুলেছিলেন লন্ডনে। যে টেনিস ভারতকে গোটা বিশ্বে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তিনবার টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ (দলগত ভাবে) ডেভিস কাপে ফাইনাল খেলেছে ভারত। রমানাথনকৃষ্ণন বিজয় অমৃতরাজ, রমেশ কৃষ্ণন হয়ে সাম্প্রতিককালে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি, সানিয়া মির্জা, রোহন বোপান্নার দৌলতে গোটা দুনিয়ার টেনিস সমাজ ভারতকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। গ্রান্ডস্লাম, এটিপি, ডব্লুটিএ সব খেতাব ভারতে এসেছে। বাকি শুধু অলিম্পিক সোনার পদক। লিয়েন্ডার অবশ্য সিঙ্গলসে অলিম্পিক ব্রোঞ্জ জিতেছেন। দুর্ভাগ্য তার ও মহেশের, যখন তারা বিশ্বের এক নম্বর জুটি তখন অলিম্পিকে শীর্ষ বাছাই ও ফেবারিট হিসেবে খেলতে নেমেও পদক জিততে পারেননি। অনেকটা রজার ফেডেরারের জীবনের সঙ্গে তুলনা টানা যায়। ফেডেরার ১৭টি গ্রান্ডস্লাম-সহ বহু এটিপি খেতাব জিতেছেন। অলিম্পিক সোনাও পেয়েছেন ডাবলসে স্ট্যানিস্লাভ ওয়ারিংকার সঙ্গে জুটিতে। কিন্তু সবেধন নীলমণি সিঙ্গলস সোনাটির জন্য এই বয়সেও রিওর কোর্টে নিজেকে উজাড় করে দেবেন। আর এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মার্টিনা হিঙ্গিস যিনি কিনা দুই ভারতীয় লিয়েন্ডার পেজ ও সানিয়া মির্জার সঙ্গে মিক্সড ও লেডিস ডাবলসে জুটি বেঁধে খেলেন এবং পরের পর গ্রান্ডস্লাম জেতেন, তিনি অলিম্পিকে ফেডেরারের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন। আর ভারতীয় জুটির সবচেয়ে বড় বাধা এই সুইস মহাতারকা জুটিই। তাই দেখার গ্রান্ডস্লামের গৌরবগাথা অলিম্পিকে নতুন করে লিখতে পারেন কোন জুটি। ▌

শব্দরূপ-৭৮০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

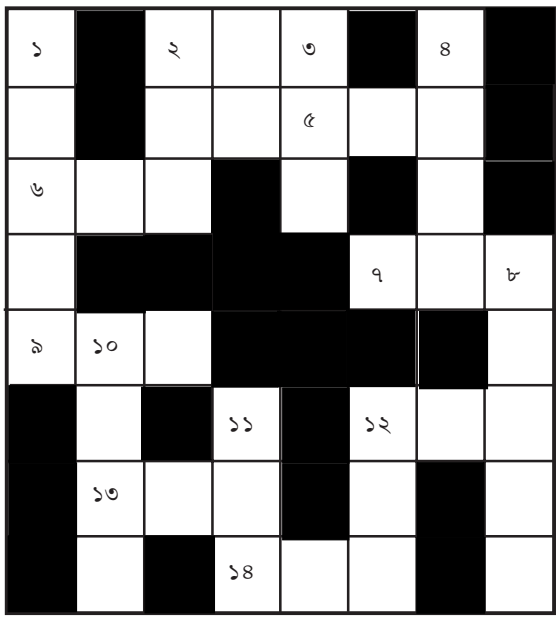

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. গায়ে কাঁটাযুক্ত পশুবিশেষ; শল্লকী, ৫. বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান, ৬. রক্ত, ৭. যজ্ঞকাষ্ঠ, ইন্ধন, ৯. সোনা রুপা ইত্যাদিতে খোদাই-য়ের কাজ, ১২. ভুক্তাবশেষ, এঁটো, ১৩. সূর্যবংশীয় রাজাবিশেষ, এর আমল মানে অতি প্রাচীনকাল, ১৪. সুবর্ণ, সোনা।

উপর-নীচ : ১. মৃত্যুর পর পুনর্বার সজীব হওয়া, ২. জেলার প্রধান নগর, ৩. ঠগদস্যু, ৪. রাবণের মামা হনুমানকে না মেরেই মনে মনে নিজের পুরস্কার স্বরূপ লঙ্কাভাগ করেছিল, ৮. আক্ষেপ রোগ, খিঁচুনি, সাদাবাংলায় টিটেনাস, ১০. '— ভোঁ ভোঁ/যাকে পাবি তাকে 'ছোঁ', ১১. 'তোমার — যারে দাও, তারে দাও বহিবার শকতি, ১২. স্রোতের প্রতিকূল দিক্।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৈবাল সিংহ
বোলপুর, বীরভূম
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

গো	ধ	ন	■	ধৃ	ষ্ট	দ্যু	ম্ন
ষ্ঠ	■	বি	শি	ষ্ট	■	■	■
■	ভা	স	■	তা	ম	র	স
■	দু	■	■	■	■	স	■
■	রা	■	■	■	■	ক	■
মে	নী	মু	খো	■	অ	লি	■
■	■	■	ল	হ	না	■	শ্রী
প	রি	হা	স	■	দি	নে	শ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৮০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ মার্চ ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১৮

দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মিছিল

সংবাদদাতা ॥ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জেএনইউ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদে জনচেতনা মঞ্চের ডাকে এক বিক্ষোভ মিছিল কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে। কোচবিহারের সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে এই মিছিল থেকে দেশদ্রোহীদের ভারত ছাড়া করার ডাক ছাড়াও দেশদ্রোহীদের প্রশ্রয় দানকারী নেহরুবাদী ও বামপন্থী চিন্তার দৈন্যতার বিরুদ্ধে হায় হায় ধ্বনি উঠে। এই দিন সকালবেলা দেশদ্রোহীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে এবিভিপির একটি মিছিল কোচবিহারবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটি মিছিলেই ভালো সংখ্যায় জেএনইউ ও যাদবপুরের প্রাক্তনীরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার এবিভিপি-র ছাত্ররা এরকম মিছিলের আয়োজন করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবিভিপি-র ছাত্ররা দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে মিছিল করায় বাম- কংগ্রেসের কপালে ভাঁজ পড়েছে। উল্লেখ্য, কলকাতায় জাতীয়তাবাদী ডাক্তারি ছাত্ররাও আলাদাভাবে মিছিলের আয়োজন করে।

বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে কলকাতা-আগরতলা রেললাইন ২০১৭-তে

কলকাতা থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে যুক্ত করার সুন্দর এক রেলপথ তৈরি করার জন্য ভারত সরকার ৫৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ভারতীয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় এই রেলপথ আগরতলা-অখৌরা লিঙ্কের কারণে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার ১৭০০ কিলোমিটার রাস্তা কমে গিয়ে ৩৫০ কিলোমিটার হবে।

রেলওয়ে পরিষেবার কারিগরী দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ সীমা পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্র্যাকের মধ্যে ৩.৭ কিলোমিটার এলিভেটর ট্র্যাক তৈরি করা হবে, যা জমির অনেক উপরে থাকার জন্য উর্বর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে না।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে এসে এই পরিযোজনার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির বদলে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে পূর্বোত্তর ভারত যুক্ত হলে বাংলাদেশ বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে বলে বাংলাদেশের নাগরিকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

উত্তর দিনাজপুর জেলার ঈশ্বরপুরে গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত শ্বেতাম্বর তেরাপন্থ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। পাশে আচার্যশ্রী মহাশ্রমণ।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
29 February - 2016 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

Wide beam angle for better light spread

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!